প্রাচ্যবাণী

পূর্ণচন্দ্র সিংহ স্মৃতি-তর্পণ



ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৩৫৭

প্রকাশক
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
যুগ্মসম্পাদক, প্রাচ্যবাণীমন্দির
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীশুকদেব সিংহ
যোড়াসাঁকো সিংহ পরিবার
১৪৫।১, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
ও
প্রাচ্যবাণীমন্দির
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৯
কলিকাতা, ১৩৫৭

মুদ্রাকর
শ্রীউপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, এম্-এ (কম্), বি-এল্
আই. এন. এ. প্রেস
১৭৩নং রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

নিবেদন

যোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত সিংহ পরিবারের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয় বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ (১০ই আশ্বিন, ১৩৫৭) বুধবার বেলা ১২ ঘটিকার সময় অমৃতলোকে মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁর মহাপ্রয়াণে কেবল কলিকাতার নয়, সমগ্র বঙ্গদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। স্বাধীন ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন জাতীয় কর্তব্যনিচয়ের মধ্যে অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ, সংস্কৃতই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, আমাদের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার সংযোগ-সূত্র, বিভিন্ন প্রাদেশিক কৃষ্টি ও সভ্যতার মিলনকেন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র ছিলেন এই মহিমময়ী দেবভাষারই আজীবন একনিষ্ঠ সেবক। ভারতে স্বাধীনতা-সমাগমের বহু পূর্ব থেকেই পূর্বপুরুষগণের পূত পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং নিজের সমগ্র পরিবারকেও প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। স্বাধীনতা-সমাগমের পর এই তিন বছর পূর্ণচন্দ্র অমিত উৎসাহে কেবল কলিকাতায় নয়, সমগ্র বঙ্গদেশেই তাঁর আজীবন সাধনার ফল সংপ্রসারণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নানাভাবে পণ্ডিত মহাশয়দের সাহায্য দান, সংস্কৃত গবেষণাগার স্থাপন, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ প্রভৃতি উপায়ে তিনি সংস্কৃত জননীর নিরন্তর অর্চনা করে গেছেন।

আমাদের 'প্রাচ্যবাণী' মন্দিরের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও স্তম্ভস্বরূপ। এই মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি স্বকীয় ভবনে একটী

শাখা সংস্থাপন করেছিলেন ; এবং মহাপ্রয়াণের পূর্বদিন পর্যন্ত এর উন্নতি ও হিতসাধনের জন্যে প্রাণপণ প্রযত্ন করে গেছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের আজন্ম সেবক, বিশেষ করে, 'প্রাচ্যবাণী'র শ্রেষ্ঠ হিতাকাঙ্খী এই সুহৃদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সামান্য হলেও তাঁর স্বর্গত আত্মার তৃপ্তি বিধান করতে সমর্থ হবে—এ বিশ্বাস আমরা রাখি। সে জন্যই অতি অল্প সময়ের মধ্যেও এ স্মৃতি-অর্ঘ্য রচনা করতে ভরসা করলাম।

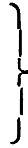
কঠোপনিষদ্ ও শ্রীশ্রীচণ্ডী তাঁর প্রাণতুল্য প্রিয় ছিল। সে জন্য এদুটী গ্রন্থও সম্পূর্ণ এখানে প্রকাশিত করা হ'ল। বিগত বৎসরে ঠিক এমন দিনে তিনি তাঁর বাড়ীতে মহোৎসাহে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর যে মহতী সভা আহ্বান করেছিলেন, সে সভায় তাঁর অনুরোধে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমি একটী বক্তৃতা করেছিলাম। আমার পক্ষে পরম আনন্দ ও সান্ত্বনার বিষয় যে, সে বক্তৃতা তাঁর আনন্দপ্রদ হয়েছিল। তাঁর পুত্র শ্রীমান্ শুকদেব এবং তাঁর কন্যা আজন্ম সংস্কৃত-সেবকা কল্যাণীয়া বাণীর ইচ্ছানুসারে সেটীও এখানে শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকারূপে সন্নিবিষ্ট করা হ'ল।

আগামী ২৭শে অক্টোবর, ১৯৫০ (১০ই কার্তিক, ১৩৫৭) তাঁর পুণ্য শ্রাদ্ধ-বাসরে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় সহস্রাধিক বিশিষ্ট টোলাধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয় এবং পাঁচ শতাধিক অন্যান্য সংস্কৃতানুরাগী সুধীবৃন্দের করকমলে অর্পণ করা হবে। পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র এবং আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ শুকদেব সিংহ এ গ্রন্থ-প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন ক'রে পিতার উপযুক্ত সন্তানের কাজ করেছেন। এ গভীর শোকে তাঁকে ও তাঁর ভগিনীদের সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদের নেই, তবে যে বিশ্বমাতার পরম মঙ্গলময়ী স্বরূপ তিনি এ

মরজগতেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে অমৃতলোকের আস্বাদ পেয়েছিলেন, তারি মধ্যে তাঁরা খুঁজে পাবেন চরম শান্তি ও স্থিতি—এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

ক্ষিপ্রতা, তৎপরতা ও সহৃদয়তার সহিত এ গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সম্পাদনা করার জন্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, এম-এ, বি-এল্ মহাশয় ধন্যবাদার্হ।

৺বিজয়া দশমী
২০শে অক্টোবর, ১৯৫০
প্রাচ্যবাণীমন্দির
ফেডারেশন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
যুগ্মসম্পাদক, প্রাচ্যবাণীমন্দির

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রবন্ধাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

গ্রন্থাবলী

———



পূর্ণচন্দ্র সিংহ

জন্ম : ১৫ই আশ্বিন, ১২৯৪। (১লা অক্টোবর, ১৮৮৭)

মৃত্যু : ১০ই আশ্বিন, ১৩৫৭। (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০)

যোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার *

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-বেদান্ত-সাংখ্য-তীর্থ
(অধ্যাপক, সংস্কৃতবিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

যোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার আমাদের দেশের অলঙ্কার-স্বরূপ এবং আমাদের দেশবাসিগণের গৌরবের বিষয়। এই পরিবারের সহিত আমি সুদীর্ঘ কাল হইতে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আমি এই পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই অসাধারণতা লক্ষ্য করিয়াছি এবং ইঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুভব করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। এই পরিবার সম্বন্ধে আমার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে—এই পরিবারের যে কোন ব্যক্তিই যে কোন অবস্থায় থাকিলেও আমি দেখিবামাত্রই বলিতে পারিব—এই ব্যক্তি যোড়াসাঁকোর সিংহপরিবারের লোক। ইঁহাদের মধ্যে এইরূপই একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যে—ইঁহাদের চাল-চলন, কথা-বার্ত্তা, আচার-ব্যবহার দেখামাত্রই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইঁহাদের শিষ্টতা, সুভব্যতার একটি অসাধারণ স্বরূপ আছে, যাহা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না। এই পরিবারের লোকেরা সকলেই বিদ্যোৎসাহী, নিজেরা বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক, হিন্দুসমাজের প্রাচীন পদ্ধতির উপর অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন। ইঁহাদের দানশীলতার একটা অসাধারণতা আছে, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। ইঁহারা প্রচুর দান করেন, কিন্তু সেই দানের কথা গ্রহীতা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে না। ইঁহারা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাহাকেও দান করেন না এবং মান, যশঃ ও প্রতিপত্তিলাভের জন্যও দান করেন

* বিগত ৭ই অক্টোবর, ১৯৫০ (২০শে আশ্বিন, ১৩৫৭) তারিখে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরে পূর্ণচন্দ্র সিংহের মহাপ্রয়াণে অনুষ্ঠিত শোকসভায় পঠিত।

না। ইঁহাদের দান পত্রিকাদিতে প্রচারিত হয় না। বিপন্ন ব্যক্তি ইঁহাদের দ্বারস্থ হইয়া কেহই বিমুখ হয় না। এই পরিবারের ব্যক্তিবর্গের ব্যবহার এতই সুমিষ্ট ও সরল, যে উহা মানুষ মাত্রেরই চিত্তকে বিমুগ্ধ করে। আমার মনে হয়—ইঁহাদের গুণরাশির বর্ণনা করিলে যেন তাহার উজ্জ্বলতারই হানি ঘটে।

এই বংশের উজ্জলতম রত্ন ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, যাঁহার শুভ নাম বঙ্গদেশবাসীমাত্রের, কেবল বঙ্গদেশবাসীমাত্রের কেন, সর্ব্বদেশের বিদ্বৎসমাজের নিকট প্রখ্যাত, সেই ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় নিজে অসাধারণ বিদ্বান্, অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ও দেশের বিদ্বজ্জনের আশ্রয় ও বিশ্রামস্থল ছিলেন। তাঁহার জীবিতকাল অতি অল্প হইলেও এই অল্পকালের মধ্যেই ভারতের অমূল্য রত্ন, কেবল ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর অমূল্য-সম্পদ্ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়া ও তাহা মুদ্রিত করিয়া মানবসমাজের তিনি ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। যে সময়ে ৺সিংহ মহাশয় মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বিশুদ্ধ পাঠ-সংবলিত অখণ্ড মহাভারত পুস্তক সংগ্রহ করাও দুষ্কর ছিল। আমাদের দেশের লোক ৺কাশীরাম দাস মহাশয়ের রচিত বাংলা মহাভারত পাঠ করিয়াই মহাভারতের সহিত পরিচিত হইত। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের রচিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হইবার ফলে দেশের লোকের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। সর্ব্ববিদ্যার নিধান সুবিশাল মহাভারতেরও বঙ্গানুবাদ হইতে পারে, ইহা ৺সিংহ মহাশয়ের পূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। আজ নানাস্থানে মহাভারত মুদ্রিত হইয়াছে, দেশের ও বিদেশের মণীষিবৃন্দ মহাভারতের নানাবিধ আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, মহাভারতের প্রাচীন টীকা-টিপ্পনীও বর্ত্তমান সময়ে অলভ্য নহে, সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের

অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া ৺সিংহ মহাশয়ের মহাভারতের অনুবাদ রচনা কালের অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে না। এই মহাভারতের অনুবাদ রচনা কালে ৺সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে যেন বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকত। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী মহাভারতের নানাবিধ সংশয় নিরসনের জন্য ৺সিংহ মহাশয়ের সভায় সর্ব্বদা আহূত হইতেন। সভায় আহূত পণ্ডিতবর্গের সহিত ৺সিংহ মহাশয়ের একখানি সুবৃহৎ তৈল-চিত্র এই বাড়িতেই সুরক্ষিত ছিল—ইহা আমি স্বচক্ষে বহুবার দেখিয়াছি।

৩

৺স্বর্গীয় সিংহ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র (দত্তক) ৺বিজয় চন্দ্র সিংহ অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তিনি অসাধারণ বিদ্বান্‌, অসাধারণ বিদ্যানুরাগী, সর্ব্বদেশের বিদ্বজ্জনগণের অসাধারণ মিত্র, অসাধারণ ধার্ম্মিক, প্রাচীন পদ্ধতিতে দৃঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি চিকিৎসাতে অদ্বিতীয়, প্রিয়দর্শন, মধুরভাষী, দরিদ্রজনের আশ্রয়, প্রার্থীজনের প্রার্থনাপূরক এবং শত্রুর প্রতিও দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। এইরূপ পুরুষ আমি আর দেখি নাই। আমার মনে হয়—৺বিজয় সিংহ মহাশয়ের গুণের প্রখ্যাপন করিলে তাঁহার গুণ ত প্রখ্যাপিত হয়ই না, প্রত্যুত ছোট মুখে বড় কথা বলিয়া তাঁহাকেই ক্ষুদ্র করা হয়। ইঁহার গুণের একমাত্র বেত্তা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, মানুষের বুদ্ধি দিয়া তাঁহার গুণের পরিমাণ করা একান্ত অসম্ভব। ৺সিংহ মহাশয়ের ৺মাতা, তাঁহার পত্নী, তাঁহার পুত্র-কন্যা ও পৌত্রগণের সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ব্যবহার নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি এবং এই বংশের অতিশয়িত গৌরব শ্রদ্ধানতচিত্তে স্মরণ করিয়াছি ও এখনও স্মরণ করি।

এই ৺বিজয় সিংহ মহাশয়ের সহোদর ভ্রাতা ৺পূর্ণচন্দ্র সিংহ

মহাশয়, যাঁহার নামের পূর্ব্বে স্বর্গীয় শব্দটি উচ্চারণ করিতে হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত হইতেছে, যিনি পূর্ণ আয়ুঃ ভোগ না করিয়াই অতি অল্পদিন হইল স্বর্গগমন করিয়াছেন ও স্বর্গস্থিত তাঁহার পুণ্যশ্লোক পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহিতও সুদীর্ঘকাল হইতে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ৺বিজয় সিংহ মহাশয়ই একদিন ইঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি ৺বিজয় সিংহ মহাশয়কে বলিয়াছিলাম—আপনাকে যিনি জানেন, তিনি ইঁহাকেও জানেন; 'আপনার দেহের সহিত ইঁহার দেহের এতই সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান যে—আপনাকে জানিলে ইঁহাকে আর পৃথক্ ভাবে জানিবার আবশ্যকতা থাকে না।' আমার মনে আছে—একদিন আমি ৺পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের একমাত্র সুযোগ্য পুত্রকেও এই কথাই বলিয়াছিলাম। ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহাশয় যখন শ্রীমানের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন, তখন আমি বলিয়াছিলাম—সিংহ পরিবারের লোক দেখিলেই আমি চিনিতে পারি। ৺পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয় অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী এবং পণ্ডিতবর্গের আশ্রয়স্থল ছিলেন। ইনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং সংস্কৃতবিদ্যার ও সংস্কৃতবিদ্যাসেবিগণের পরমবান্ধব ছিলেন। এই বংশের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ইনিও কোনরূপ যশঃ, মান, খ্যাতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অতিসঙ্গোপনে সংস্কৃতবিদ্যাসেবিগণের রক্ষণ ও পরিপোষণের জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছেন। ইঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা অতুলনীয়। ইঁহার সংযম অতি সুদৃঢ়। ইনি অতি-ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে সুদৃঢ় সংযম পালন করিয়াছেন, তাহাতে এই বংশের ভাবিপুরুষগণের আয়ুঃ ও যশঃ বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। ৺পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয় সুপুরুষ, মিষ্টভাষী, বিনীত, শ্রদ্ধালু এবং নিরভিমান

ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি বালকের মত সরল ছিল; যে কোন ব্যক্তি তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহার হৃদয়ের সারল্য উপলব্ধি করিতে পারিত। অকালে তাঁহার স্বর্গগমনে আমাদের অপূরণীয়, অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে। যে কোন সৎকার্য্যের জন্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে সর্ব্ববিধ সহায়তা তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাইত। তিনি অতিমাত্র সজ্জনতাবশতঃ নিজের দেহের দিকে লক্ষ্য না করিয়াও সজ্জনোচিত রীতি রক্ষা করিবার জন্ত অগ্রসর হইতেন।

আমি এই সিংহ মহাশয়দের বাড়ীতে একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ দেখিয়াছিলাম। যখন ৺বিজয় সিংহ মহাশয় জীবিত ছিলেন, তখন তিনি নিজে আমাকে ঐ প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইয়া তাহাতে সুসজ্জিত তৈলচিত্রাবলী আমাকে দেখাইয়াছিলেন ও তাঁহাদের পরিচয় বলিয়া দিয়াছিলেন। এই সিংহবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ, যাঁহারা বাংলায় প্রথম আগমন করেন, তাঁহাদেরই চিত্রাবলী ঐ প্রকোষ্ঠে সুরক্ষিত ছিল। জানিনা আজিও সেই সমস্ত চিত্রাবলী তাঁহাদের গৃহে সুরক্ষিত আছে কিনা। আমি যখন প্রথম ঐ চিত্রগুলি দেখিয়াছিলাম, তখন হর্ষ ও বিস্ময়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই সমস্ত চিত্রে সিংহ মহাশয়গণের পূর্ব্বতন পুরুষগণ চিত্রিত রহিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, গৌরকান্তি এবং বীরবেশে সুসজ্জিত। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মস্তকে শিরস্ত্রাণ শোভিত হইতেছে, সকলেই বৃহৎ সুসজ্জিত অশ্বে আরূঢ়, নানাবিধ তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রগ্রাম তাঁহাদের কটিদেশে আবদ্ধ ও হস্তে শোভিত হইতেছে। মহার্ঘ বর্ম্মাদিদ্বারা তাঁহাদের দেহ আবৃত রহিয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই মুখ তেজোদৃপ্ত ও গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। এই চিত্রাবলী দেখামাত্রই সকলেরই মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে—ইঁহারা সাধারণ লোক হইতে পারেন না। এই চিত্র দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে—ইঁহাদেরই

বংশধরেরা আজ সিংহ পরিবারের লোক বলিয়া পরিচিত হইলেও ইঁহাদের পূর্ব্বতন পুরুষগণের সহিত আজ ইঁহাদের মহদ্‌বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যদিও এই বংশ নানাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, তথাপি ইঁহাদের পূর্ব্বতন পুরুষগণের গুণগরিমা আরও বিপুলতর ছিল ; ইঁহারা শাসকই ছিলেন, শাসিত ছিলেন না। দুর্লঙ্ঘনীয় কালপর্য্যয়বশতঃ বহু বৈলক্ষণ্য ঘটিলেও এই বংশের অসাধারণতা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ৺ভগবচ্চরণে বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি যে—এই বংশের বর্ত্তমান বংশধরেরা তাঁহাদের পূর্ব্বতন গৌরবমণ্ডিত অবস্থায় উপনীত হইয়া চির-প্রতিষ্ঠিত থাকুন।

৺পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সুযোগ্য একমাত্র পুত্রের প্রতি আজ আমাদের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার ৺পিতার এবং পিতৃপুরুষগণের গৌরবমণ্ডিত আদর্শের অনুসরণ করিয়া বংশের যোগ্যতম সন্তানরূপে, পিতার উপযুক্ত অধিকারিরূপে, বিদ্বজ্জনের বান্ধবরূপে, প্রার্থিজনের আশ্রয়রূপে এবং স্বকীয় বান্ধববর্গের যথার্থ বান্ধবরূপে সুদীর্ঘজীবী হইয়া প্রতিষ্ঠিত থাকুন, ৺ভগবচ্চরণে ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

———

পূর্ণচন্দ্রসিংহমহোদয়স্য মহাপ্রয়াণে

শোকরুদিতম্ *

কলিকাতারাজকীয়সংস্কৃতকলেজ-টোলবিভাগ-প্রধানাধ্যাপক-

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ-তর্কাচার্য্যস্য

অস্তং গতো হা বত পূর্ণচন্দ্রঃ
ব্যাপ্তা দিশো ধ্বান্তচয়েন সর্বাঃ।
শোকাশ্রু মুঞ্চন্তি বুধাঃ সমস্তাঃ
সহায়হীনা ছুরদৃষ্টলীনাঃ॥

সমুন্নতিং সাধয়িতুং বুধানাং
প্রাচীনবিদ্যাভ্যুদয়ং বিধাতুম্॥
প্রাচীনকৃষ্টিং পরিরক্ষিতুঞ্চ
কো বা বরেণ্যো ভবিতাগ্রগণ্যঃ॥

সিংহান্বয়ে সিংহ ইবেদ্ধবীর্য্যঃ
কো বার্য্যধর্মপ্রতিকূলপক্ষম্।
দক্ষঃ প্রতিক্ষিপ্য বসুন্ধরায়াং
ধর্মস্থিতিং ধর্মজুষাং বিদধ্যাৎ॥

ঐশ্বর্য্যযোগেঽপি যদীয়শীলং
নৈবাভিমানাদিবিকারভূমিঃ।
স এষ হা প্রোজ্জ্বলপূর্ণচন্দ্রঃ
ক্রূরেণ কালেন বত ক্ব নীতঃ॥

---

* বিগত ৭ই অক্টোবর, ১৯৫০ (২০শে আশ্বিন, ১৩৫৭) তারিখে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরে পূর্ণচন্দ্র সিংহের মহাপ্রয়াণে অনুষ্ঠিত শোকসভায় পঠিত।

নাস্তিক্য-সম্ভূততমোবিভূত্যা
বিপদ্যমানে সুকৃতে ধরায়াম্।
তদাশ্রয়া যে কৃতিনো মহান্তঃ
তেষামসাবন্যতমঃ প্রশস্তঃ ॥

স্বপূর্বজানাং সুকৃতে রতানাং
সংরক্ষিতুং গৌরবমার্য্যযোগ্যম্।
যস্যাভবৎ পূর্ণতয়া প্রযত্নঃ
স পূর্ণচন্দ্রো বত নাস্তি লোকে ॥

হে পূর্ণচন্দ্র প্রথিতানুভাব !
পাপপ্রভাবে জগতি প্রকীর্ণে।
ন বাসযোগ্যা ধরণী তবেয়ং
তস্মাৎ কিমাপ্তোঽসি সুরাধিবাসম্ ॥

ত্বদীয়বংশ্যা বিপুলাশিষা তে
ত্বৎসাম্যমাসাদ্য যশো লভন্তাম্।
তদ্দর্শনাদার্য্যগুণা জগত্যাং
নন্দন্তু নিত্যং দধতাঞ্চ বৃদ্ধিম্ ॥

ত্রিদিবভুবি সদা তে শাশ্বতী শান্তিরাস্তাম্।
স্মর সুচিরমিহাস্মান্ পূর্ববৎ সর্বকৃত্যে।
বিধিবিহিতকৃপাভিস্ত্বৎসমাঃ সাধুধুর্য্যাঃ
পুনরিহ জনিমাপ্ত্বা সাধয়ন্তু প্রশস্তিম্ ॥

পূর্ণচন্দ্র

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় জগতে প্রতিদিনে ও প্রতিক্ষণে কত প্রাণী বা কত মানব আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে, তাহার কেহ হিসাব রাখে না, হিসাব রাখিতে পারে না এবং হিসাব রাখিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করে না ; কিন্তু সমুদ্রের যে তরঙ্গটি আলোকময় কোন মহামণি বক্ষে ধারণ করিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, সকলেই তাহার হিসাব রাখে ও আলোচনা করে ; সেইরূপ যে মানুষ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া সৌভাগ্যবশতঃ অসাধারণ গুণবান্ হইয়া লোকসমাজের দৃষ্টিগোচর হয় ; সকলেই তাহার হিসাব রাখে ও গুণের আলোচনা করে। সুতরাং আজ আমরা একজন অসাধারণ গুণবান্ পুরুষের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কবি বলিয়াছেন—

> "অল্পয়া নহি জনো নিজশক্ত্যা শক্তিমান্ গণয়িতুং গুণরাশিং।
> অন্নপুঞ্জমিব বালবিড়ালঃ কিন্তু দূষয়তি তং মুখদানাৎ ॥"

তাই আমাদের ভয় হয়, আমরা ইঁহার গুণ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া সমুদয় বলিতে না পারিয়া ইঁহাকে খর্ব করিয়া না ফেলি। আমাদের এই আলোচ্য পুরুষপ্রবরের নাম ৺পূর্ণচন্দ্র সিংহ। ইনি মানস সরোবরের রাজহংসের ন্যায় স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের একবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বংশোচিত সমস্ত গুণই তাঁহার মধ্যে ছিল। তিনি ধার্ম্মিক অথচ তেজস্বী, বিদ্বান্ এবং বিনয়ী, দাতা ও অনভিমানী, ধনী অথচ কোমলস্বভাব ছিলেন। এককথায় ইহাই বলা যায় যে, যিনি তাঁহার

সহিত একবার আলাপ করিতেন, তিনি কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। এই পুরুষপ্রবরের তিরোধানে আমাদের সমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা কবে পূর্ণ হইবে বা পূর্ণ হইবে কিনা তাহা বলা দুষ্কর। এক্ষণে আমরা সর্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—তাঁহার সুযোগ্যপুত্র শ্রীমান্ শুকদেবচন্দ্র সিংহ সুস্থদেহে দীর্ঘজীবী হইয়া পিতার ন্যায় সমস্ত সদ্‌গুণ লাভ করিয়া সর্বপ্রকার উন্নতিসম্পন্ন হউন এবং তাঁহার অপর পরিবার সকল শান্তিতে ও সুখে থাকুন।

———

সংস্কৃতসেবকঃ পূর্ণচন্দ্রঃ

মহামহোপাধ্যায়-শ্রীচিন্নস্বামী শাস্ত্রী,

(কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপকঃ)

যদ্যপি নাহমিতঃপূর্বমজানাং বিশেষতো দিবং গতং শ্রীপূর্ণচন্দ্রসিংহ-মধিকৃত্য, পরং তদ্দিনে তদীয়-শোকসভায়াং যদশ্রৌষং মহামহোপাধ্যায়-পণ্ডিত-শ্রীযোগেন্দ্রনাথ-বেদান্ততর্কতীর্থ-মহামহোপাধ্যায়-পণ্ডিত-শ্রীকালী-পদ-তর্কাচার্য-প্রভৃতীনাং পণ্ডিতপ্রকাণ্ডানাং লেখতো মুখতশ্চ, তেন নিরচিনবম্—যদস্য মহাপুরুষস্য কুলপরম্পরাগতৌদার্যমহিম্নঃ, নিরতিশয়ধর্ম-প্রেম্নঃ, লোকোত্তরগুণাকরস্য, অবর্ণনীয়ামরভারতীসংবর্ধনবদ্ধশ্রদ্ধস্য বিশেষতো বিদ্বদারাধনৈকপ্রবণমনসঃ, ইতঃ পরলোকগমনং সনাতনধর্মস্য, বিশেষেণ সুরভারত্যাঃ সুমহতীং হানিমুদপীপদদিতি। নেয়ং ত্রুটিস্সহসা পূরয়িতুং শক্যতে। বিরলবিরলা হ্যেতাদৃশঃ সৎপুরুষাঃ। দুর্লভাস্সত্যামপি মহত্যাং সম্পৎসমৃদ্ধৌ অস্পৃষ্টাভিমানলেশা গুণৈকনিধয়ো ধর্মপরায়ণাঃ। চিন্তয়ন্তো বয়মিমামতিমহতীং হানিং সর্বথা দূয়ামহে। কিং কুর্মঃ, সর্বানপি হি কবলয়ত্যয়ং কালহতকঃ। সর্বথা সর্বেশ্বরং সর্বশক্তিং প্রার্থয়ামো যদস্য মহাপুরুষস্য সর্বাঙ্গীনা সুখৈকরূপা শান্তির্ভবতু, তৎপরিবারোঽপি সহতাং দুঃখমিদম্, অপনুদতু চ শোকম্, অনুসরতু তদীয়ং ধর্মৈকময়ং পন্থানম্। যেন কেনাপি রূপেণ যত্রকুত্রাঽপ্যবস্থিতোঽয়ং মহানাত্মা লভতামনুত্তমং ফলমাত্মনঃ পুণ্যরাশেরপরিমিতস্যেতি॥

আশ্বিনশুক্লষষ্ঠী, কলিকাতা।

বন্ধুর উদ্দেশ্যে

শ্রীজয়ৎসেন ঘোষ

ওগো বন্ধু!

আজ তোমাকে হারিয়ে আমি বড়ই একা হয়ে পড়েছি। তুমি যে আমার কতখানি অন্তর জুড়ে ছিলে, তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তুমি ছিলে একাধারে আমার বন্ধু, সখা, সাথী, প্রিয় অনুজের মতই। আমার আট বৎসর বয়স হ'তে আজ ৬৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কখনও আমরা ছাড়াছাড়ি হইনি। তোমাকে ছেড়ে থাকতে, আমি কত যে দুঃখ, কত যে বেদনা অনুভব কর'ছি, এখন তোমাকে কি করে তা' বোঝাব?

মনে পড়ে আজ বহুদিনের কথা, যখন আমরা ছোট ছিলাম; তুমি যখন তুলির দ্বারা সৌন্দর্য্যের রূপ ফোটাতে, আমি তখন পাশে বসে কত রকমের কত যে গল্প করতুম, তা'তে হয়ত তোমার কাজের কিছু কিছু বিঘ্নও ঘটাতুম, কিন্তু তোমাকে কখনও বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখিনি, হাসতে হাসতে তুমি তোমার কাজ শেষ করে ফেলতে।

তুমি বিদ্যানুরাগী, স্বদেশ-প্রেমিক, বন্ধু-বৎসল, আত্মীয়-জন-পালক; তুমি শিল্পী, বহু দিকে পরিব্যাপ্ত তোমার কাজের ধারা; তুমি জ্ঞানী, তুমি গুণী, তুমি সংস্কৃতানুরাগী, বহু গুণে তুমি পূর্ণ। দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য শত-বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তুমি যে সব মহৎ কাজ করেছ, তা' কেউই কখনও ভুলতে পারবে না; তুমি দাতা, তুমি বীর, তুমি সিংহ। সিংহের ন্যায়ই তুমি তেজস্বী, সিংহের ন্যায়ই সাহসী, সিংহের ন্যায়ই তুমি ধীর স্থির।

প্রতিদিন তোমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করলে আমি স্থির থাকতে পারতাম না। যে কোনো কাজে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, সেই কাজ করলে, আমি মনে শান্তি পেতাম না। তুমিও আমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কোন কাজ করতে না।

তোমার নিজ হাতে গড়া পুষ্পোদ্যানে, আমরা বসে বসে কত গল্পই না করেছি; আজ তুমি চলে যাওয়াতে, সেইখানে বসে কার সাথে প্রাণ-ভরে কথা কইব? আজ থেকে একটি আসন চিরতরে শূন্যই হয়ে গেল। আজ তোমার হাতে প্রাণ-পাওয়া প্রকৃতি-দেবীর সবুজ সন্তানেরাও, তোমার বিয়োগে কাতর।

আজ তুমি পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছ। যাবার সময় তোমার সঙ্গে একবার দেখাও হ'ল না; এ দুঃখ আমার অন্তরে বজ্র-সম আঘাত করছে। জানি না অন্তরের এই আকুল-আহ্বান তোমার কানে পৌঁছবে কি না?

"ভগবান তোমার আত্মার শান্তি বিধান করুন।"

ইতি—

তাং ৩রা কার্ত্তিক, ১৩৫৭
২৫নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট,
জোড়াসাঁকো।

তোমার আজীবন বন্ধু
শ্রীজয়ৎসেন ঘোষ

———

শ্বশুর মহাশয় *

শ্রীসুনীল কুমার ঘোষ, এম্-এ, বি-এল
(এ্যাডভোকেট, আলিপুর কোর্ট)

আমার সহিত ৺পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রায় ৮ বৎসরের আলাপ। আমি তাঁহার পুত্রস্থানীয় মধ্যম জামাতা। তিনি ধার্মিক ছিলেন বা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন বা একজন মহাপুরুষ ছিলেন—এসব কিছুই বলিব না—কেননা তাহা আপনাদের বিচার-সাপেক্ষ। আমি শুধু গোটাকয়েক ঘটনাবলীর উল্লেখ করিব—যাহা হইতে তিনি মানুষ হিসাবে কিরকম ছিলেন তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন এবং বিচার করিতে পারিবেন। সমাজের দিক দিয়া আপনাদের অনেকেই তাঁহার গৃহে পদধূলি দিয়া তাঁহার সঙ্গসুখ অনুভব করিয়াছেন এবং তাঁহার অনেক কিছুই আপনারা অনেকেই জানেন। আমার সহিত দৈনন্দিন তাঁহার বহু আলোচনা বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে, যাহা হইতে তাঁহাকে মানুষ হিসাবে জানিবার প্রকৃষ্ট সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

আমি যখন প্রথম তাঁহার বাড়ীতে যাই তিনি আমায় প্রথম উপদেশ দেন যে, "দেশ এখন স্বাধীন হইতে চলিয়াছে—তোমাদের সকলেরই কর্তব্য আছে—তোমাদের বাবুয়ানা পরিত্যাগ করিয়া নিয়মানুবর্তিতা পালন করা উচিত।" তিনি নিজে পাতলা কাপড় জামা কখনো পরিতেন না বা অপর কেউ পরিলেও সহ্য করিতে পারিতেন না, "খদ্দর—গান্ধীজীর আদেশ—সকলকার পরা উচিত"—এই কথাই বার বার বলিয়াছেন। আমি বলিতাম, "এই বিংশ শতাব্দীতে যেখানে বর্তমান যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক

---

* ৭ই অক্টোবর, ১৯৫০ (২০শে আশ্বিন, ১৩৫৭) তারিখে প্রাচ্যবাণী মন্দিরে পূর্ণচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে অনুষ্ঠিত শোকসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

উন্নতি প্রচণ্ডবেগে অগ্রগতি লাভ করিতেছে সেখানে খদ্দর পরা বা পরাকে সহানুভূতি দেখানো বিংশ শতাব্দীতে পঞ্চম শতাব্দীর গরুর গাড়ীকে সহানুভূতি দেখানো নয় কি ?" তিনি বলিতেন, "না তা নয়—খদ্দর পরার উদ্দেশ্য যে শুধু মোটা কাপড় পরা—তা নয়—প্রতিটি নিষ্কর্মা বা যাহাদের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করিয়াও যথেষ্ট সময় হাতে থাকে অথচ যাহারা দরিদ্র—তাহারা যাহাতে খদ্দর উৎপাদন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে—তাহাকেই সাহায্য করা—তা'ছাড়া বিলাতী বস্ত্রের প্রতি লোভ দমন করিয়া নিজের দেশের মোটা কাপড়ের বা অন্যান্য জিনিষের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করাই অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।" তিনি নিজে যে খদ্দরের ধুতি এবং ছোট ফতুয়া পরিতেন ইহা আমি বরাবর দেখিয়াছি। বাস্তবিক আমারো বেশীর ভাগ সময় খদ্দর পরার মূলে তিনি। আমার বিবাহের পর আমার আলমারী বোঝাই হয় খদ্দরের জামা কাপড়ে—অনেকে মন্তব্য করেন—"বাবা, এ যে সবই চট—এতো চট পরা যায় কি করে ?"—কিন্তু উত্তর পরে পাইয়াছিলাম। আমি প্রথম হইতেই দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহার বাড়ীতে বিছানাগুলি ছাড়া আর কোথাও কোনও গদীর চিহ্ন নাই—১টি কি ২টি হয়ত আছে—কিন্তু তার বেশী নেই—আর সবই কাঠের—কেবল কাঠ। তাই আমি একদিন ভগিনীদের প্রশ্ন করিয়াছিলাম—কেননা আমার বেশী বাবুয়ানা না থাকিলেও কাষ্ঠাসনে আমি এতটা অভ্যস্ত ছিলাম না—"এর কারণ কি।" তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "পাছে আমরা আরামপ্রিয় ও ভোগবিলাসী হই—সেইজন্যে এই ব্যবস্থা ; তাহা আপনার উপরেও প্রযোজ্য।"

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও তাঁহার যথেষ্ট বিচার-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। খরচ বেশী না করিয়াও বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য-তালিকা তিনি প্রায়ই দিতেন—এবং সেগুলি তাঁর বহুদেশ ভ্রমণের ফল—

খাদ্যতালিকা শিশুরই হোক বা প্রৌঢ়েরই হোক তাহার প্রত্যেকটি বিশেষ খাদ্যপ্রাণ সংবলিত। এবং এরূপ খাদ্য-তালিকা সচরাচর সাধারণ গৃহে দেখা যায় না।

শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে—তিনি ইংরেজী শিক্ষার খুব ভক্ত ছিলেন না—বিশেষতঃ তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা যে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিবে—ইহা তাঁহার আদৌ পছন্দ ছিল না। ইহা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক আমার সহিত তাঁহার হইত। তিনি বলিতেন—"ত্যাখো—আমাদের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত অত্যন্ত সমৃদ্ধশালিনী—মানুষ হইবার উপকরণ তাহাতে কিছু কম নাই—এবং আমরা সকলেই সেই ভাষাকে ত্যাগ করিয়াছি। হিন্দুর হিন্দুত্ব যদি এখনো বজায় থাকে ত অন্তঃপুরেই আছে; সেখানে একান্ত অর্থনৈতিক কারণে প্রয়োজন না হলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে জিয়াইয়া রাখা উচিত। কে বলিতে পারে ভবিষ্যতে এই ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা বলিয়া গণ্য হইবে না?"—ইত্যাদি।

তাঁহার দেবদ্বিজে ভক্তির সম্বন্ধে আপনাদিগকে আমার কিছু বলিতে হইবে না। পণ্ডিতমণ্ডলী সবই জানেন, কিন্তু এই ভক্তির গভীরতা কতটা ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কথা হইতেই বুঝিতে পারিবেন। একদিন আলোচনাচ্ছলে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমহাশয় তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, "আরে মহাশয়, আপনাদের সার জে. সি. বোস অমুক করিয়াছেন তমুক করিয়াছেন—গাছের প্রাণ আছে বলিয়া ভারী লাফালাফি করিতেছেন—আমাদের অমুক শাস্ত্রে ওকথা বহুদিন আগে বলা আছে।" এই কথাগুলি আমার আদৌ পছন্দ হইল না; পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া গেলে—কর্ত্তাকে বলিলাম, "পণ্ডিত মহাশয়ের কথাটা কি রকম হইল? আমাদের শাস্ত্রে অনেক কথাই ত বলা আছে কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিবার এবং সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজের উত্তরোত্তর

উন্নতি করিবার চেষ্টা কোথায় এঁদের? গাছের যে অনুভূতি আছে—তাহার কত প্রকার ক্রিয়া—কিভাবে তার উন্নতি হয় এবং সমাজের কাজে লাগে—এগুলি পণ্ডিত মহাশয় নিশ্চয়ই বিবেচনা করেন নাই।"

তিনি বলিলেন, "তোমার কথা ঠিক বটে—কিন্তু সংস্কৃতের অধ্যয়ন, অর্থনৈতিক চাপে এবং আমাদের সকলের উপেক্ষায়, বর্তমান সময়ে খুব কম পণ্ডিতই আছেন যাঁরা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, করিতে পারেন বা করিবার সুযোগ পান। আমি জানি, অনেক জিনিষের সংস্কৃতেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা আছে কিন্তু অনেক জিনিষের হয় পাঠোদ্ধার হয় নাই, নয় সংসারের চাপে পণ্ডিত মহাশয়েরা চর্চ্চা করিবার সুযোগ পান নাই। মাত্র চারি আনা পয়সার দক্ষিণার আশায় থাকেন পণ্ডিতেরা অনেকেই। এঁরা ত তবু সল্‌তেটি জ্বালিয়া রাখিয়াছেন।" ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য দেশের পত্রিকা তিনি অনেকগুলি নিতেন এবং প্রত্যেকটি তিনি বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। যে কোনও বিষয়েই হোক না কেন—তাঁর নিজের যেমন সংগ্রহ করার চেষ্টা ছিল—সেই চেষ্টা আমাদের মধ্যেও জন্মাইয়া দিবার ইচ্ছা করিতেন। কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম্ম, কি শাস্ত্র, কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, সর্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্য না থাকিলেও বিশ্লেষণ ও বিচাবশক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল এবং তাঁহার সহিত যে কোনও আলোচনা ক'রে শুধু আমি কেন—অনেকেই বিশেষ লাভবান হইয়াছেন।

বর্তমান রাজনৈতিক তর্ক—ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, তাঁহাকেও করিতে হইয়াছে। তিনি ধনতন্ত্রবাদকে যে পছন্দ করিতেন তাহা নয় কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের 'রাশিয়ার সব কিছুই ভাল'—ইহা মানিতেন না; তিনি বরং গান্ধীবাদী ছিলেন।

স্বীয় পল্লীর প্রতিকাজে তাঁহার সাক্ষাৎ যোগাযোগ না থাকিলেও তিনি সকল কার্য্যের সংবাদ রাখিতেন এবং কোথায় কি অসুবিধা হইতেছে তাহা কিরূপে দূর করা যায়, জনসাধারণের উপকার কিভাবে হয়, তাহা জানিয়া যথাযোগ্যভাবে কার্য করিতেন। যোঁড়াসাঁকো কেন, কলিকাতার বহুলোক তাঁহার কাছে বহুভাবে উপকৃত আছেন। ছয়ের পল্লী জনসমিতির প্রতিকাজে তিনি তাঁর অমূল্য উপদেশ দিয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। শিল্পে—তৈলচিত্রাঙ্কনে, এবং ফটোগ্রাফীতে—তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহা তাঁহার ঘরের তৈলচিত্রগুলির দিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এবং এই সব বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বা তথা হইতে পুস্তক আনিয়া জ্ঞানলাভ করিতেন। গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান ছিল—তাহা খুব কম লোকেরই থাকে; ইহা তাঁহার বাটিসংলগ্ন বাগানটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার বাগানে অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছ বিদ্যমান।

তাঁহার মত একজন গুণী দেশপ্রেমিক মহাজনকে হারাইয়া দেশজননী সত্যই ক্ষতিগ্রস্তা হইলেন। আমাদের শোক তো ইহজীবনে ফুরাইবার নয়। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন যাবজ্জীবন তাঁহার আশীর্বাদের যোগ্য থাকিতে পারি।

———

পূর্ণপ্রকাশ পূর্ণচন্দ্র

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল (অক্সন্),
এফ-আর-এ-এস্-বি
অধ্যক্ষা, লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ, ও যুগ্মসম্পাদিকা, প্রাচ্যবাণী মন্দির,
কলিকাতা।

পুণ্যশ্লোক পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের স্নেহসুকোমল, হাস্যসমুজ্জল, শান্ত, সমাহিত মূর্তি আর দেখতে পাবোনা, এ যেন ভাব্‌তেই পারি না।

পূর্ণচন্দ্র ছিলেন সত্যি জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের পূর্ণ প্রকাশ। অগণিত গ্রন্থ, সাময়িক পত্রিকা, মাসিক প্রভৃতি, বিশেষতঃ আমাদের সভ্যতামূলক গ্রন্থরাজি নিরন্তর অধ্যয়ন ক'রে তিনি অসীম জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। স্বপ্রকাশ ছিল তাঁর প্রজ্ঞা ; তাই বহির্জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান এ উভয়ের সম্মেলনে তাঁর জ্ঞানসমুদ্র সর্বদা যেন পরিপূর্ণ থাকতো। যাঁরাই তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্র আলাপ আলোচনা করেছেন, তাঁরাই তাঁর এই সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হয়েছেন। তবে, যে জিনিষটা আমাদের সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করতো সেটা হচ্ছে—তাঁর জ্ঞানের আভা ছিল, কিন্তু উত্তাপ বা উগ্রতা ছিল না—অর্থাৎ সে জ্ঞানের জন্য তাঁর কোনও অহঙ্কার ছিল না। "বিদ্যা বিনয়ং দদাতি" এই মহাবাক্য তাঁর জীবনে হয়েছিল পরিপূর্ণ ভাবেই সার্থক।

জ্ঞানের চরম বিকাশ ভক্তিতে। কেবল বাহির থেকে জানা নয়, কেবল বুদ্ধি দিয়ে বোঝা নয়, সেই সঙ্গে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা, সাক্ষাদ্ভাবে উপলব্ধি করা, ভক্তির মাধ্যমে, ধ্যানের বলে সে সত্যকে অন্তরালোকে উদ্ভাসিত করা—এই হ'ল আমাদের শাশ্বত আদর্শ।

পরমভক্ত ভক্তিভাজন সিংহ মহাশয়ের জীবনও ছিল পবিত্রতম ভক্তির একটী মূর্ত ধারা। তাঁর ঈশ্বরভক্তি কেবল মুখের কথাই ছিল না; তা' ছিল তাঁর মর্মের নিগূঢ় উপলব্ধি; এই শোক-দুঃখময় মর জগতের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সেই মহান, সচ্চিদানন্দ, অমৃতময় পুরুষকে। সে জন্য তিনি ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ, সংসারের সকল বিপদ্-বিপর্যয়ের মধ্যেও অনুদ্বিগ্নমনা। ভগবচ্চরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে তিনি যে শান্তি, স্থৈর্য ও প্রসন্নতা লাভে ধন্য হয়েছিলেন, তারি প্রকাশ আমরা দেখেছি তাঁর শান্ত, সৌম্য, সুপ্রসন্ন, সদাহাস্যময় মূর্তিতে।

কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির প্রকৃষ্ট প্রকাশ হয় উপযুক্ত কর্মে। পূর্ণচন্দ্রও ছিলেন অতন্দ্রিত কর্মপ্রিয়। বিশ্রামের সময় ছিল তাঁর ধরা-বাঁধা; অন্য সময়ে তিনি নিরন্তর কর্মব্যাপৃত থাকৃতেন। তদুপরি তাঁর কর্মে ও সাধারণ লোকের কর্মে ব্যবধান ছিল প্রচুর। তিনি সব সময়েই সমাজ-সেবায় বহুলভাবে ব্যাপৃত থাকৃতেন। ছাত্রদের উপকার-সংসাধন, পণ্ডিত মহাশয়দের দু:খদৈন্য দূরীকরণ, বন্ধুবান্ধবদের সদুপদেশ প্রদানে কল্যাণপথে পরিচালন—এ নিয়েই তিনি ধ্যানমগ্ন থাকৃতেন। ভারতীয় সাধনার প্রথম ও প্রধান কথা—নিষ্কাম কর্ম, অর্থাৎ, কোনওরূপ ফল বা প্রতিদান প্রত্যাশা না ক'রে নিরলস কর্তব্যকর্ম সম্পাদন। সিংহ মহাশয়কে দেখেছি সারা জীবন লোকের উপকার সাধন ক'রে গেছেন, কিন্তু সত্যি, তিনি তাঁর ডান হাতে যা' দান করতেন, তাঁর বাঁ-হাত পর্যন্ত তা' জান্‌তে পারতো না। কোনওরূপ সম্মানের প্রত্যাশা তাঁকে জীবনে করতে দেখিনি। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, আমাদের সামান্য একটু মুখের কথায় তিনি কত ছাত্রকে বছরের পর বছর আহার ও বাসস্থান দিয়ে মানুষ করে দিয়ে গেছেন,

কত পণ্ডিত মহাশয়দের আর্থিক সংস্থান করে গেছেন, কত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে দান করে গেছেন—কিন্তু সবই নীরবে। বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ, যে যুগে যে নিজেকে যত প্রচার করতে পারে, সেই তত মান সম্মানের অধিকারী হয়। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় সিংহ মহাশয় আমাদের এ যুগের লোক ছিলেন না—আরণ্যক যুগের ঋষিদের মতই তিনি ছিলেন পূতচরিত্র ও নিঃস্বার্থ কর্মব্রতী। সংসারের সকল ভোগসুখ ও আড়ম্বরের মধ্যেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নিঃস্পৃহ, নিরভিমান। এইরূপ দেবোপম, আদর্শবাদী মহাপুরুষ বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক যুগে সত্যই অতি দুর্লভ।

সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় মাত্র ৭।৮ বৎসরের, যা নিরবধি কালের দিক থেকে সংখ্যাগণনায় অতি তুচ্ছ। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই, কেবল তাঁর সঙ্গে নয়, তাঁর সমগ্র পরিবারের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যে নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়ে গেছে—তার পরিমাপ কেবল দিন বা বৎসর গুণে করা যায় না। মহাকবি ভবভূতি বলেছেন—

> "ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতু-
> র্ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
> বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং
> দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ॥"

অর্থাৎ, সূর্যের উদয়ে পদ্ম যেমন আপনা থেকেই বিকসিত হয় এবং চন্দ্রের উদয়ে চন্দ্রকান্ত মণি যেমন আপনা থেকেই বিগলিত হয়—এর আর বাইরের কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—ঠিক তেম্‌নি দুজনের মধ্যে আন্তরিক প্রীতি বা সৌহার্দ স্বতঃই বিকসিত হয়ে উঠে, সাংসারিক বাহ্যিক কোনও কারণ বিনাই।

৺ সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের প্রীতিও ছিল যেন ঠিক এমনিই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রথম দিন থেকেই তিনি যেমন আমাদের দু'হাত বাড়িয়ে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তেমনি ভাবে আমাদের স্নেহাভিষিক্ত করে গেছেন। বিশেষ করে, আমার প্রতি তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না। কতবার যে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে সাদরে আহ্বান করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। আমাদের কোনও রকম কোনও সাফল্য ও উন্নতি বা প্রশংসায় তাঁরি আনন্দ দেখেছি চিরকাল হ'ত সব চেয়ে অধিক। তিনি তখনি টেলিফোনযোগে আমাদের সেজন্য আশীর্বাদ করে আনন্দ জানাতেন। আমার নূতন পদপ্রাপ্তিতে তিনি যে কত আনন্দোচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, আজ তা' বারংবার মনে পড়ে হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠ্ছে।

আমাদের 'প্রাচ্যবাণী'র তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি এরূপ গভীর শ্রদ্ধা সত্যি খুব কম দেখেছি। ভারতীয় আদর্শের প্রতি তাঁর যে একটী পরম নিষ্ঠা ছিল, তা' তিনি কেবল মুখের কথাতে নয়, কাজেও বহুলভাবে প্রমাণ করে গেছেন। আমি যখন প্রথম শুন্লাম যে, তিনি তাঁর মেয়েদের ইংরাজী পড়ান নি, কেবল সংস্কৃতই পড়িয়েছেন, তখন এই বিংশ শতাব্দীতে এ কথা যেন বিশ্বাসই করতে পারিনি। কিন্তু পরে দেখেছি, সত্যি তিনি তাঁর মেয়েদের ভারতীয় একটী শুচি, স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যেই গড়ে তুলেছেন। তার ফলে তাঁর পরিবারে এমন একটী উন্নততম ভারতীয় আদর্শ দেখা যায়, যা' বর্তমানে অন্যত্র একান্ত বিরল।

৺সিংহ মহাশয় মহাপ্রয়াণ করেন বুধবার ২৭শে সেপ্টেম্বর—সেদিন যুগপ্রবর্তক মহাত্মা রামমোহনেরও তিরোধান দিবস। এই সংবাদ যখন টেলিফোনযোগে আমার কাছে পৌছায় তখন আমাদের কলেজ হলে

একটী প্রকাণ্ড সভা হচ্ছিল, যার সভানেত্রী ব'লে সে সভা ত্যাগ করা ছিল আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সংবাদটী শোনামাত্রই মনে হ'ল, সমস্ত যেন শূন্য হয়ে গেল—আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য প্রচারের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার প্রধান কর্ণধার আমাদের মাঝ দরিয়ায় ভাসিয়ে চলে গেলেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী আজ আর নেই!

পরে মনে হয়েছে—কিছুই শূন্য হয়ে যায় নি, হ'তে পারে না। কারণ তাঁর আদর্শ, তাঁর উদাহরণ, তাঁর অনুপ্রেরণাই আমাদের জীবনকে চিরপূর্ণ করে রাখ্‌বে। আমরা ভারতীয়েরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী—আমরা স্থির বিশ্বাস করি যে, এই পার্থিব জীবন একটি উন্নততর আধ্যাত্মিক জীবনের সোপানই মাত্র। সে উন্নততর অমৃত লোক থেকে তিনি তাঁর স্নেহসজাগ দৃষ্টি আমাদের প্রতি অনুক্ষণ নিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের ঠিক তিনদিন পূর্বে তিনি আমাদের বাড়ীতে "প্রাচ্যবাণী"র সাপ্তাহিক অধিবেশনে অনেকরাত পর্যন্ত থেকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্যে একটী নবপরিকল্পনা প্রণয়ন করে গেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'লে, তিনি কত আদরে বল্লেন, "মা! তুমি কবে আমার বাড়ীতে আসবে বল, তোমাকে যে আমার বড় প্রয়োজন।" তাঁর সেই প্রযোজন যদি আমরা সামান্য মাত্রও মিটাতে পারি, তাঁর সেই অসমাপ্ত ব্রত যদি আমরা সামান্যমাত্রও সাফল্যের পথে অগ্রসর ক'রে দিতে পারি—তবেই হবে আমাদের আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সার্থক ও সম্পূর্ণ, অন্যথা নয়।

———

পুণ্যকীর্ত্তি সিংহ পরিবার

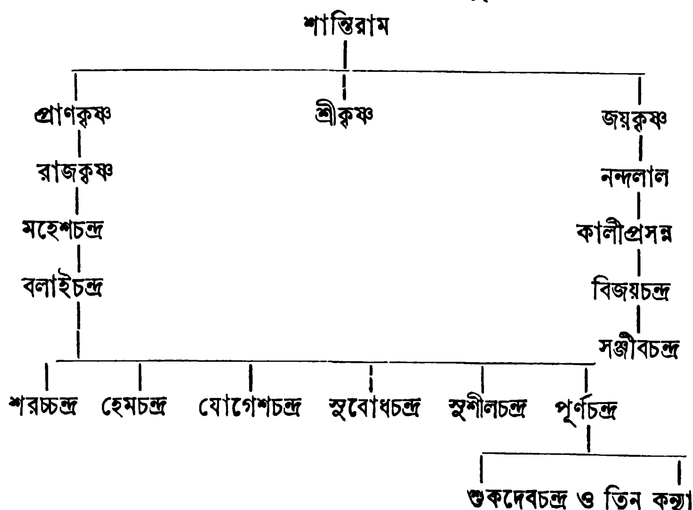
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

(অধ্যক্ষ, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ, কলিকাতা)

পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয় যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তা' সকল দিকেই বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। পূর্ণচন্দ্রের একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, চূড়ান্ত স্নেহপ্রবণতা, অপূর্ব সারল্য, অনাড়ম্বর হিতৈষণা, বিপুল প্রতিভা, অতুল দানশীলতা, অসাধারণ কর্মবীরত্ব—এই সব কিছুরই বীজ তাঁর পরিবারের ইতিহাসে নিহিত রয়েছে। তাহাই তাঁর নামের সার্থকতা প্রমাণিত করবার জন্যই যেন তাঁ'তে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ লাভ করেছিল। তারই কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

তাঁর বংশ-পরিচয়

প্রথম বঙ্গদেশে আগত পুরুষ



শ্রীকৃষ্ণ সিংহ

ইনি ডেভিড হেয়ার এবং এইচ. এইচ. উইলসনের পক্ষাবলম্বনে হিন্দুকলেজের কার্যকরী সমিতির সদস্য রূপে দেশের শিক্ষোন্নয়নের বিশিষ্ট সহায়তা করেছিলেন।

রামকমল সেনের নেতৃত্বে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে যখন বরখাস্ত করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ডিরোজিও'র পক্ষাবলম্বনে তাঁর বিশেষ সহায়তা করেন। ডিরোজিও তাঁর ২৫।৪।১৮৩১ তারিখের পদত্যাগ পত্রে বলেন—

"I must also avail myself of this opportunity of recording my thanks to Mr. Wilson, Mr. Hare and Babu Sree Kissen Sing for the part which I am informed they respectively took in your proceedings on Saturday last" (see p.p. 20—21 of Peary Ch. Mitra's 'A Biographical sketch of David Hare'; also Edward's "Life of Henry L. V. Derozio").

১৮৪২ সালের ১লা জুন তারিখে ডেভিড হেয়ার মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ সালের ১৭ই জুন তারিখে কাশিমবাজারের রাজা ৺কৃষ্ণনাথ রায়ের উৎসাহে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে মেডিকেল কলেজ হলে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসংরক্ষণের জন্য একটী মর্মর মূর্তি স্থাপনের নিমিত্ত ভারতবাসীদিগের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে যে সমিতি গঠিত হয়, তন্মধ্যে মহাত্মা কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহ মহাশয় এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহ উভয়েই ছিলেন অন্যতম সদস্য। তাঁদের নাম :—

(১) কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়

(২) ভূকৈলাসরাজ সত্যচরণ ঘোষাল

(৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৪) নন্দলাল সিংহ
(৫) শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
(৬) রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
(৭) দিগম্বর মিত্র
(৮) মাননীয় বিচারপতি রমাপ্রসাদ রায় (রাজা রামমোহনের পুত্র)
(৯) প্যারীচাঁদ মিত্র
(১০) হরচন্দ্র ঘোষ
(১১) রামগোপাল ঘোষ
(১২) তারাচাঁদ চক্রবর্তী

ভারতীয় ও অভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মিলনক্ষেত্র ছিল বহুকাল ধ'রে যোড়াসাঁকোর সিংহভবন। কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্তৃক উদ্বোধিত 'ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভা' বহুবৎসর ধ'রে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাসভবনেই অনুষ্ঠিত হতো। ১৮৫৫ ও ১৮৫৭ সালের ১লা জুন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।*

জয়কৃষ্ণ সিংহ

শান্তিরাম সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র জয়কৃষ্ণ সিংহ দেশে শিক্ষা বিস্তার মানসে বিস্তর অর্থব্যয় করেছিলেন; হিন্দু কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের পুস্তকাগারে একটি প্রস্তর ফলকে তাঁর নাম এখনও দৃষ্ট হয়।

---

*প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত Biographical sketches of David Hare নামক গ্রন্থের ৯৪ এবং ১০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ

সিংহ পরিবারের শ্রেষ্ঠরত্ন মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু তিনি ত্রিশ বছর বয়সে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই স্বল্পপরিসর জীবনে তিনি যে অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়ে গেছেন, তা' সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।

তিনি অতুলনীয় সম্পদের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন; তিনি প্রসিদ্ধ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, জয়কৃষ্ণ সিংহের পৌত্র এবং নন্দলাল সিংহের পুত্র। তাঁর জন্মোৎসবে সংস্কৃতের অধ্যাপকবৃন্দকে কাশ্মীরী শাল উপহার দেওয়া হয় এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের অন্যান্য উপায়ে পরিতৃপ্ত করা হয়।

কিন্তু তাঁর বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তাঁর পিতৃদেব নন্দলাল (ছাতু-সিংহ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই থেকে তিনি হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে জীবনপথে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে তাঁর প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করলে তিনি ৺চন্দ্রনাথ বসুর এক কন্যাকে পুনরায় বিবাহ করেন।

'নানা দেশের নানা ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা' এই মন্ত্রে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন আজীবন দীক্ষিত ছিলেন। স্বদেশী ভাষার হিতসাধন কল্পে তিনি মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ১৮৫৩ সালে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' স্থাপিত করেন। মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভার সভ্য ছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এ সভায় যোগদান করেছিলেন। কার্কপেট্রিক সাহেব প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতেরাও এ সভায় যোগদান করে লাভবান

হতেন। এ সভা থেকে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার নিমিত্ত পুরস্কার বিতরণও করা হতো। 'জগতে সুখী কে?' 'হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্টতা' প্রভৃতি বিষয়ে পুরস্কার ঘোষণা করে একদিকে জ্ঞানপ্রসার, অন্যদিকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রভূত প্রচেষ্টা করা হতো।

কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাধ্যমে একদিকে যেমন সাহিত্য পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সম্মানার্থ বিশেষ অধিবেশনাদিতে ব্যাপৃত থাকৃতেন। ১৮৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেশবাসীর পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসূদনের সংবর্ধনা এ সভার ইতিহাসে এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের একটী বিশিষ্ট ঘটনা। তখনকার দিনে বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী অশেষ মনীষা সত্ত্বেও স্বদেশী আচার ব্যবহার থেকে ভ্রষ্ট হয়ে দেশবাসীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদনকেও দেশবাসী তখনও পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেনি; বরং 'ছুছুন্দরী-বধ' কাব্য রচনা করে তাঁর কাব্যপ্রতিভাকে তৎকালীন বঙ্গসমাজ ব্যঙ্গ করেছিল। এই সব সামাজিক অবমাননার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে মাইকেলকে সম্মান প্রদর্শন ক'রে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন বঙ্গসাহিত্যের কত হিতসাধন করেছিলেন, তা' অভিনন্দনের উত্তরে কবিবর মাইকেলের উত্তর থেকেই সুস্পষ্ট হবে—

"বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। * * * বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জলপ্রাপ্তে যাদৃশ উর্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য"।

ফলতঃ, কালীপ্রসন্ন মাইকেলের কাব্যপ্রতিভার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—"বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।" মাইকেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কালীপ্রসন্ন সিংহই সর্বপ্রথম "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা"য় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করেন।

পাদ্রী লঙ কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন মহাত্মা কালীপ্রসন্নের জীবনের অন্যতম প্রসিদ্ধ বিশিষ্ট ঘটনা। লঙ্ ছিলেন এদেশের বিশিষ্ট সুহৃদ্; তিনি দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" ইংরাজীতে অনুবাদ করে প্রচার করেছিলেন। নীলকরেরা "লঙ্"-এর বিরুদ্ধে নালিশ করে এবং মোকর্দমায় বিচারপতি স্যার মর্ড্যাণ্ট ওয়েলস্ লঙের একমাস কারাবাস এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেন। স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন পাদ্রী লঙ্ সাহেবকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সহস্র টাকা আদালতে প্রদান করেন। কয়েক মাস পরে লঙের স্বদেশযাত্রার বিষয় অবগত হয়ে তিনি লঙ্‌কে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে বিদায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাধ্যমে পণ্ডিতবর্গের সহায়তা ও সংবর্ধনব্যতীত আরো একটি খুব ভাল কাজ করেন। সেটী হচ্ছে এই—তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময় তাঁর পক্ষাবলম্বনে যথেষ্ট সহায়তা করেন এবং বহু গণ্যমান্য লোকের সহি সহ একখানা আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করেন। বিধবাবিবাহ ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিধিবদ্ধ হ'লে বিদ্যোৎসাহিনী সভার নামে প্রত্যেক বিধবা-বিবাহকারীকে তিনি নিজে এক সহস্র মুদ্রা দান করতেন। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-নিবর্ত্তন আন্দোলনেও কালীপ্রসন্ন অন্তরের সহিত সহায়তা প্রদান করেছিলেন।

১৮৫৭ সালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার যে সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপিত হয়, তজ্জন্য মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন বিস্তর অর্থব্যয় করেন।

কলিকাতার একপ্রান্তে নগরের বেশবনিতাদের সরাবার আন্দোলনেও বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন অগ্রণী হন।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের (১৮৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত) সাহায্যে কালীপ্রসন্ন বাংলার নাট্যাভিনয় ও নাট্যসাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। তখনও পর্যন্ত উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে বাংলা নাট্যমঞ্চের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল না। রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের অনূদিত "বেণীসংহার" নাটকের ভূমিকাবিশেষে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেন। অতঃপর প্রোৎসাহিত কালীপ্রসন্ন ১৮৫৭ সনে স্বয়ং "বিক্রমোবর্শীর" বঙ্গানুবাদ করেন এবং বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চেই এর অভিনয় করেন। পুরূরবার ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন স্বয়ং অবতীর্ণ হন, এবং কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। তার পরের বৎসরে ১৮৫৮ সালে তিনি "সাবিত্রী-সত্যবান্ নাটক" স্বয়ং রচনা করেন এবং এটীও বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত করেন।

কালীপ্রসন্ন প্রথমে বিদ্যোৎসাহিনী মাসিক পত্রিকা এবং তৎপরে "সর্বতত্ত্বপ্রকাশিকা" ও "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামে দুইটী মাসিক পত্রিকা এবং কিছুদিন 'পরিদর্শক' নামক দৈনিক সংবাদপত্রও পরিচালনা করেন।

কালীপ্রসন্নের গ্রন্থাবলী

(১) বাবু নাটক।

(২) **বিক্রমোর্বশী নাটক, ১৮৫৭।**

(৩) **সাবিত্রীসত্যবান্ নাটক, ১৮৫৮।**

(৪) **মালতীমাধব নাটক, ১৮৫৯।**

(৫) **'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত বিশেষ চিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন, ১৮৬১।**

(৬) **হুতোম প্যাঁচার নকশা।** প্রথম ভাগ ১৮৬১ (?)

" " " দ্বিতীয় ভাগ ১৮৬৪

উভয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত, ১৮৬৮

(৭) **মহাভারত।** ১—১৭শ খণ্ড। ১৮৫৮—৬৬

"অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে" কালীপ্রসন্ন এ অনুবাদ রচনার ইতিহাস প্রদান করেছেন। এবং এ বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় এবং প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অকাতর সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিষয়ে তিনি যা' বলেছেন তা' দেশের বরণীয় ইতিহাস; তজ্জন্য এ অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

"আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন, এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। **বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না।** তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্যোপলক্ষ্যে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের

তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দেশ করা যায় না।...সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাকে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।”

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন এই বিরাট সপ্তদশ খণ্ডে প্রকাশিত মহাভারতের তিন সহস্র কপি বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে দান করেছিলেন।

(৮) **বঙ্গেশবিজয়।** এ গ্রন্থের দুই ফর্মা প্রকাশের সংবাদ মাত্র জানা যায়।

(৯) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (বঙ্গানুবাদ সহ)। এই গ্রন্থ মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের জন্য কালীপ্রসন্ন যে ভূমিকা লিখেছিলেন, তা'তেই তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাস ইঙ্গিত করেছেন। কে জানতো—মহাত্মার এ নৈরাশ্য বাণী এমন ভাবে সত্যে পরিণত হবে, এবং বঙ্গজননীর হৃদয়ে পুত্রের অকালমৃত্যু-শোকের জ্বলন্ত হুতাশন চিরপ্রজ্বলিত থাকবে? তিনি লিখেছিলেন—

“আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবন-সেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। ভগবদ্গীতা অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমন প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর-প্রসাদে পৃথিবীমধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোনকালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত

হওয়ায় সে ইহার মর্মানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।"

এতদ্ব্যতীত মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সমগ্র রামায়ণ অনুবাদেও কৃতসঙ্কল্প ছিলেন; এবং জুলিয়াস সীজারের জীবনীও বাংলায় অনুবাদ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

মহাত্মা কালীপ্রসন্নের রচিত বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

মহাত্মা কালীপ্রসন্নের ভাষা যেমন সাবলীল ও সুললিত, তেমনি বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত তাঁর প্রবল আগ্রহ তাঁর লেখনীতে যেন চির-উচ্ছ্বসিত। সর্বত্রই পরোপকারস্পৃহা এবং দেশপ্রেম চির বিরাজমান। কলিকাতা-পার্শ্বস্থ ভাগীরথীধারার মত হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর চিরনির্বাধ ভক্তিধারাও চিরপ্রবাহিত ছিল। বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার অন্যতম বিশিষ্ট নিদর্শন, তাঁর "মহাত্মা" উপাধি তাঁর জীবনে সত্যই সার্থক হয়েছিল।

আজ দুঃখভরে এই কথা শুধু মনে হয়, তিনি যদি ত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত না হতেন, তা হ'লে নিশ্চয় বঙ্কিমচন্দ্রের মতই অতুল প্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ বহু মণিমাণিক্য ভাষাজননীর কণ্ঠে উপহার প্রদান্ করে যেতে পারতেন, তা'তে কোনও সন্দেহ নাই। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে যেখানে যেরূপ ভাষা প্রয়োগ সুষ্ঠু, শোভন, অল্প বয়সেও সেরূপ প্রয়োগ তিনি অনায়াসে আয়ত্ত করেছিলেন। মহাভারত ও হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা গ্রন্থদ্বয় পাশাপাশি রাখলেই তা' স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। উভয় ভাষাই অনবদ্য, তবে একটী যেন হরিদ্বারের গঙ্গা-প্রবাহ— অতি স্বচ্ছ, সরল ও সাবলীল, যা'কে বাল্মীকির ভাষায় সন্মনুষ্যের মনের

মতই স্বচ্ছ বলা যায়; অন্যটী গঙ্গাসাগরসমীপবর্তী জলধারার মত—কোনও বাঁধন নাই—গতি অসংযত, বহু-প্রসারী কিন্তু উন্মুক্ত, উদার, বিশাল ও অন্তহীন।

কালীপ্রসন্নের বদান্যতা ছিল তাঁর সাহিত্য-প্রতিভারই মত অতুলনীয়, অসাধারণ। কত সহস্র প্রকারের দান তিনি করে গেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। এ মহাত্মা এমনি অজ্ঞাতসারে দান করতেন যে, কারো কিছু জান্‌বার উপায় ছিলনা। তবু যে কোনও উপায়ে যেগুলি আমাদের গোচরীভূত হয়েছে, তারি অতি অসম্পূর্ণ একটী ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

১। বহু অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনোদ্দেশ্যে দান।

২। বহু দুঃস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান।

ইং ১৮৫৮ সালের ২৬শে মার্চ তারিখের এডুকেশন গেজেটে জনৈক বিদ্যানুরাগী কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে লিখ্‌ছেন ঃ—

"ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বংশবাটী গ্রামে বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে এক পাঠশালা.........সম্প্রতি কলিকাতানিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়......মাসিক একশত টাকা দান স্বীকার করিয়া ইংরাজী শিক্ষক ও পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন।

"এই নব যুব বিদ্যোৎসাহী সিংহ মহাশয় পরোপকারে সিংহস্বরূপ হইয়াছেন। ইনি দিগ্বিদিগে আর ছয়টা অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দীনহীনগণকে তিমিরহারী জ্ঞানচক্ষু দিতেছেন। ইঁহার জীবন বৃদ্ধি ও ধনবর্ধন হইলে অস্মদ্দেশীয় জনগণের যে কত উপকার হইবে, তাহা বর্ণনাতীত।"

৩। ছাত্রদের উৎসাহপ্রদানের নিমিত্ত পদক ও বহুবিধ পুরস্কারাদি বিতরণ।

৪। অগণিত ছাত্রকে পাঠাদির নিমিত্ত অর্থ সাহায্য প্রদান।

৫। মাতৃভাষার উন্নতি সাধনার্থে দান।

(ক) লেখকদের দান। (খ) সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাহায্য দান। (গ) বিনামূল্যে লেখকদের পুস্তক প্রকাশ।

এ দান এত অগণিত যে, তা'র কিয়দংশও এখানে বিবৃত করা সম্ভবপর নয়।

এ সম্পর্কে ১২৬৮ সালের ১লা বৈশাখ তারিখের "সংবাদ প্রভাকর" থেকে কিয়ংদশ উদ্ধৃত করছি—

"বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে কালীপ্রসন্ন বাবুর যেরূপ অনুরাগ ও যত্ন আছে, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। তিনি ঐ বিষয়ে কেবল অর্থব্যয় করিতেছেন, এমত নহে; স্বয়ং লেখনীধারণ পূর্বক অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রমও করিতেছেন। বঙ্গভাষার সুলেখকদিগকে তিনি সমাদরপূর্বক গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারাই সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন। স্বয়ং মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া মহাভারতাদি মহাপুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদপূর্বক উত্তমরূপে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া অকাতরে সাধারণকে বিতরণ করাতে যে উপকার হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিলে স্বদেশহিতেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকটে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবেক। অধুনা আমরা এই স্থলে তাঁহার বিষয় অধিক না লিখিয়া পরমেশ্বরের নিকটে একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি অরোগী ও দীর্ঘায়ু হউন, এবং বঙ্গভাষার উন্নতি বর্ধন বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও অনুরাগ এবং উৎসাহবর্ধন ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকুক, স্বজাতীয়

ভাষার অবস্থা সংশোধন বিষয়ে তিনি অবিচলিত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আপনার যথার্থ কর্তব্য কার্য সাধন করিতেছেন। তিনি তদ্বিষয়ে যে সমস্ত সৎসঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইলে এ দেশের এক চির উপকার সাধন করা হইবেক। পুরাবৃত্তলেখক মহানুভবেরা হেমাক্ষরে শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্নসিংহ মহোদয়ের গুণাবলী বর্ণন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।"

সংবাদপত্র বা মাসিকপত্রের পরিচালনার সহায়তার জন্য তিনি অনেক সময় সমগ্র প্রেস ক্রয় ক'রে প্রতিষ্ঠাতাকে দান করতেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে—তিনি একটী সমগ্র প্রেস কিনে তত্ত্ববোধিনী সভাকে দান করেন। এ সম্পর্কেও তাঁর অন্যান্য দান বিষয়ে ১৮৪২ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "৺কালীপ্রসন্ন সিংহ" শীর্ষক প্রবন্ধে অকাতর স্তুতিবাদ লিখিত আছে। তিনি মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কেও "বেঙ্গলী" পত্রিকা পরিচালনার জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেন (সোম প্রকাশ, ৫. ১. ১৮৬৩)। "হিন্দু পেট্রিয়টের" সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে প্রেসের সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ করেন; তার ফলে তাঁর পরিবার বর্গের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। তাই শুধু নয়, "হরিশ মেমোরিয়েল্ ফণ্ড" সংস্থাপনপূর্বক তিনি তাতে পাঁচশত টাকা দান করেন এবং অন্যবিধ উপায়েও তাঁর দুঃস্থ-পরিবারের হিত সাধনে ব্রতী হন। "দূরবীন" নামে ফার্সী সংবাদপত্রেরও স্বত্ব ক্রয়পূর্বক ইহার পরিচালনাসৌকর্য সম্পাদন করে তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

৬। **দুর্ভিক্ষে দান**—স্বদেশে ও বিদেশে। ১৮৬১ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষে দান ও ১৮৬২ সালে ল্যাঙ্কাসায়ার দুর্ভিক্ষে দান ইত্যাদি।

৭। **জনহিতকর কার্যে দান**—কলিকাতায় পানীয় জলের অভাব দূরীকরণার্থ বিলাত হইতে চারিটী ধারাযন্ত্রের আনয়ন এবং কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্থাপন। এতে তাঁর বহু সহস্র টাকা ব্যয় হয়।

কালীপ্রসন্নের দেশ-প্রেম

অতন্দ্রিত লেখনী-পরিচালনা, অপরিমিত বদান্যতা,—কালীপ্রসন্নের এ সব কিছুর মৌলিক কারণ তাঁর অসাধারণ দেশ-প্রেম। তাঁর দেশ-প্রেমমূলক কাহিনী ও বদান্যতার বিবরণ ইতিহাসের মতই সুদীর্ঘ এবং চরম কৌতূহলোদ্দীপক। একটী মাত্র উদাহরণ সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করছি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ যখন নীলদর্পণ মোকর্দমায় বাঙ্গালীদের মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ব'লে গালাগালি করলেন, তখন সমগ্র জাতির এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মহাত্মা কালীপ্রসন্ন বদ্ধপরিকর হন এবং ১৮৬১ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাট-মন্দিরে এক বিরাট সভা আহ্বান-পূর্বক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি দেশবরেণ্য সুধীবৃন্দের সমক্ষে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ওয়েলসের বিরুদ্ধে বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষর সমন্বিত এক আবেদনপত্র তিনি লণ্ডনে তখনকার সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট সার্ চার্লস উডের কাছে প্রেরণ করেন। তার ফলে ওয়েলস্ চাকরী থেকে বিতাড়িত হন।

যে মহাত্মা নিজের জীবনকে ধূপের মত জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে ভগবানের আরাধনা এবং দেশবাসীর জীবন সৌরভময় করে গেছেন, বিচারপতির আসনে সমারূঢ় হয়ে তিনি যে দুঃস্থ দেশবাসীর অসাধারণ কল্যাণ সাধন

করবেন এবং সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিত্ব বজায় রাখ্‌বেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সম্পর্কেও তাঁর খ্যাতি অফুরন্ত এবং এ স্বল্পাবসরে তার বিবৃতি সম্ভবপর নয়।

সর্বতোভাবে অতুলনীয় এ মহাত্মা, বঙ্গজননীর সিংহবিক্রম সন্তান কোটী কোটী দেশবাসীর অজস্র, অপরিমিত আশীর্বাদ উপেক্ষা ক'রে মাত্র ২৯ বৎসর (?) বয়সে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় দেশজননীর ক্রোড়দেশ পরিত্যাগ ক'রে বিশ্বজননীর ক্রোড়ে চিরাশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরমাত্মীয় বিয়োগব্যথায় বিধুর, হতাশ্বাস নিখিল বঙ্গ দেশবাসী ভগ্নহৃদয়ে মুহ্যমান হয়ে রইল।

প্যারীমোহন কবিরত্ন মহাশয় তাঁর 'গীতাবলী'তে যে গান লিপিবদ্ধ করেছেন, তা' এখানে উদ্ধৃত করছি—

রাগিণী সবেরি, তাল একতালা।

দেশহিতৈষী কালীসিংহ গুণগ্রাহী গুণাকর।
গিয়াছেন স্বর্গধামে ত্যজে মনুজ কলেবর॥
আক্ষেপ অতি অল্পকালে, গ্রাসিল করাল কালে,
বিষয়চ্যুত চিন্তানলে, দেহ ছিল জরজর॥
এত বিখ্যাত অল্প দিনে, বাঙ্গালী মহলে আর দেখিনে
সুযশ মহীরুহ রোপণ করে গিয়াছেন বিস্তর॥
ভয়ানক তুফান নীলদর্পণে, জজ্‌ ওয়লেসের কোপাগুনে,
লংকে করিল রক্ষা সমাজে অতি সত্বর॥
কম লিখেছে কি হুতোম পেঁচায়, টের পেয়েছেন অনেক বাছায়,
অনেকের দোষ সুধ্‌রে গেছে, যারা ছিল দোষের সাগর॥

বিষয় গেল এই এক দোষ, বৃথা করা আপ্‌শোষ,
সকলের সকলি যাবে, সংসারে কিছু দিনান্তর ॥
মহাযশঃ মহানভারতে, রেখে গিয়েছেন ভারতে
কবি কয় ভারতবর্ষে, জন্মাবেনা তেমন নর ॥

বিজয়চন্দ্র সিংহ

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন নিষ্পুত্রক ছিলেন; সেজন্য তিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বলাইচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পুত্র, পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মধ্যমাগ্রজ বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

ধর্মপ্রাণ বিজয়চন্দ্র সিংহ

বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ও পিতার অতুলনীয় গুণরাশি ও বিপুল ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তাঁর ডাক নাম ছিল "মাখন", এবং ঠিক মাখনের মতই নরম ছিল তাঁর প্রাণ। পরের দুঃখ দেখ্‌লে কিছুতেই তিনি ঠিক থাকতে পারতেন না। অকাতর দানের ফলে তিনি তাঁর বিশাল সম্পত্তি উত্তরজীবনে প্রায় হারিয়ে ফেলেন; তথাপি তিনি মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সমানে দান করে গেছেন—শত্রু-মিত্র নির্বিচারে। মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে স্বকীয় বাসভবনে ১৩৪০ সালের ২৪শে বৈশাখ রবিবার মধ্যাহ্ন একটার সময় মহাপ্রয়াণ করেন।

তাঁর অনবদ্য চরিত্র সৌরভে ও সৌন্দর্যে সকলকে আমোদিত করে রেখেছিল; কোথাও মলিনতার তিলমাত্র তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। চূড়ান্ত ভোগের উপকরণের মধ্যস্থলে তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী। পরোপকারই ছিল জীবনের একমাত্র ব্রত। তাঁর আত্মবিহ্বল সাধন-প্রভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভারতবর্ষে হয়ে উঠ্‌লো সু-সমৃদ্ধ।

তাঁর অসাধারণ গবেষণা শক্তিপ্রভাবে তিনি নবাবিষ্কৃত এলোপ্যাথি ঔষধ হোমিওপ্যাথিতেও বের করে নিতেন। এর উপরে তিনি অনেক বিষৌষধির পরীক্ষা স্বকীয় শরীরে করতেন এবং তার ফলাফল আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রবন্ধের মারফতে জানাতেন এবং সেখানকার সকলকে চমৎকৃত করে দিতেন। এরূপ তাঁর আবিষ্কৃত বহু ঔষধ হোমিওপ্যাথি বৈজ্ঞানিকগণ স্বকীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। অনেকে মনে করেন—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে বিজয়চন্দ্রের স্থান মহাত্মা হ্যানিমেনের অব্যবহিত পরেই।

বিজয়চন্দ্রের সাধনালব্ধ ফল ঃ—

১। **ইনসুলিনের হোমিওপ্যাথি সংস্করণ।**

২। **হোমিওপ্যাথি মতে নবযৌবনলাভের জন্য ঔষধ আবিষ্কার,** যার ফলে অনেকের মতে এলোপ্যাথি অস্ত্রোপচার ও ইন্‌জেকসন্ ব্যর্থ বলে প্রতীত হবে।

৩। **যক্ষ্মার হোমিওপ্যাথি ঔষধ আবিষ্কার।** এটাই বিজয়চন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ডায়েবিটিশ রোগের পরিণতিতে প্রায় থাইসিস হয় ; তার চিকিৎসা-পদ্ধতি নির্ণয় (হোমিওপ্যাথি মতে) করার জন্য তিনি শেষ জীবনে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু সাধনায় ফল লাভের পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন।

৪। **শিশুর খাদ্য 'মল্টেড্ ফুড', সুভ্যালো স্নো-ক্রীম, সাবান** প্রভৃতি আবিষ্কার।

তাঁর চিকিৎসায় সহস্র সহস্র রোগী আরোগ্য লাভ করেছে ; ইচ্ছা করলেই তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জন করতে পারতেন। অথচ আশ্চর্যের

বিষয়, রাজা মহারাজদের কাছ থেকেও তিনি কোন দিন এক পয়সাও চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করেননি। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অতি প্রিয়ছাত্র ছিলেন এবং গুরুর মত সন্ন্যাসজীবন তিনিও অতিবাহিত করে গেছেন গৃহস্থ হয়েও।

বিজয়চন্দ্র এত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন যে, যখন যেখানে যে কোনও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হতো, তিনি তা' নিজব্যয়ে ক্রয় করে তাঁর লেবোরেটরীতে আনতেন।

এ নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক কেবল বিজ্ঞানের হিতসাধন করেননি। তিনি পিতৃ-পরিচালিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" কাগজ নূতন আর্টপেপারে ছাপা উচ্চশ্রেণীর সচিত্র সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত করেন এবং "দর্শক" নামে একখানি সচিত্র বাঙ্গালা সাপ্তাহিকও প্রকাশিত করেন। ভারতবর্ষে উন্নত প্রণালীর মুদ্রণ ও চিত্রশিল্পের চমৎকারিত্ব বিধানের জন্য লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে তিনি বিশাল মুদ্রণযন্ত্র ও ব্লক প্রস্তুত বিভাগ প্রতিষ্ঠা ক'রে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। অতি আশ্চর্যের বিষয়, সাফল্যলাভের পরেই প্রেসের যাবতীয় সরঞ্জাম ও মেসিনারী "বসুমতী"কে স্বল্পমূল্যে বিতরণ করেন—যার ফলে বসুমতীর অসাধারণ উন্নতি হলো। বিজয়চন্দ্রের গুরুপুত্র রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রবিভাগের ক্যামেরা, মেসিনারী প্রভৃতি সমস্ত মূল্যবান জিনিষ নিজ বাড়ীতে নিয়ে যান।

জ্যোতিষশাস্ত্রেও বিজয়চন্দ্রের বিশেষ অধিকার ছিল। গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান, বিবর্তনাদি নিরীক্ষণের জন্য বাড়ীর ত্রিতলে বহুমূল্য যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত থাকতো। বহু ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিনি কারবারে নানাভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মনিষ্ঠ প্রাণ কারবারীদের পরিবেশের মধ্যে অতি সহজে স্বভাবতই হাঁপিয়ে উঠেছিল। বিধর্মিস্পৃষ্ট পাউরুটী

ভোজনে হিন্দুর ধর্মনাশ হয় এই বিবেচনায় তিনি কোন রাসিয়ান ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নিজ বাড়ীতে প্রকাণ্ড উনান প্রস্তুত করিয়ে, নিজ ব্যয়ে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণের বাড়ীতে পাঠানোর সুব্যবস্থা করেন।

তাঁর জীবনের এমনি আর একটী ঘটনা বলি। মৎস্যতত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য তিনি স্বগৃহে এক ইঞ্চি মোটা কাঁচের চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়ে, বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে জল প্রবাহিত রাখবার বন্দোবস্ত ক'রে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্যকেও তার মধ্যে তিনি বাঁচিয়ে রাখ্‌তেন। কোনও ইংরাজ ধর্মযাজক তার ভূয়সী প্রশংসা করতেই তিনি সকল উপকরণ সহ সমস্ত মৎস্যসম্প্রদায় তাকে উপহার দিয়ে পুনরায় নির্লিপ্ত হয়ে রইলেন।

জগতে তিনি ছিলেন নিরাসক্ত নিরালম্ব; তাই যেদিন কোনও এক অসদ্বন্ধুর পরামর্শে ইহুদী কোম্পানীকে ছয় লক্ষ টাকা ধার দিয়ে তিনি বিপদগ্রস্ত হলেন, সেদিনও তাঁর সদাপ্রসন্ন আনন মুহূর্তের জন্যও পরিম্লান হয়নি।

সদ্‌গ্রন্থপাঠ তাঁর চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায় ছিল। রাত্রি দুটা আড়াইটা পর্যন্ত তিনি সর্বদা পাঠনিরত থাক্‌তেন। চিত্রাঙ্কণও তাঁর অতিপ্রিয় ছিল। কীর্তন ও কথকতাও তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন।

বৈজ্ঞানিক বিজয়চন্দ্র ছিলেন ধর্মনিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক। তিনি ভগবানের শ্রীশ্রীচরণসরোজে আত্মনিবেদিত ছিলেন। বৈদিক প্রথায় বিশ্বকামনা যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর তিনি প্রতিদিন রোগিগণকে ঔষধ বিতরণ করতেন।

এ সব সদ্‌গুণের অনন্যসাধারণ অধিকারীর উদ্দেশ্যে তাই তাঁর বন্ধু কবি শ্রীসুদর্শন চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন নিম্নোদ্ধৃত কবিতার মাধ্যমে—

মানব দেখে না পরে, নিজ তরে সতত ব্যাকুল।
দেবতা পরের ব্যথা বুকে করি' কাঁদিয়া আকুল॥

বিজয়চন্দ্রও তাঁর পূর্বপুরুষের মতই সঙ্গোপনে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে দান করতেন। তাঁর দানরাশির কোনও ইয়ত্তা ছিলনা।

বিজয়চন্দ্র মানুষের দোষ চোখে দেখতে পেতেন না, তা' নয়; কিন্তু চোখে দেখতে চাইতেন না বলেই তিনি বহুবার বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছিলেন।

এই বিজয়চন্দ্রেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন **পুণ্যশ্লোক পূর্ণচন্দ্র সিংহ**।

———

পুণ্যশ্লোক পূর্ণচন্দ্র

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

(অধ্যক্ষ, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ, কলিকাতা)

পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে বিগত ২৭শে অক্টোবর, ১৯৫০ তারিখে মধ্যাহ্ন দ্বাদশ ঘটিকায় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পরিবার-বর্গের সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে স্বসাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করেছেন।

সেই ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ, 'ক্ষাত্রধর্ম ইবাশ্রিতঃ' বীরপুরুষের হাস্যসমুজ্জ্বল প্রাণোদ্দীপ্ত বদনমণ্ডল আর আমাদের চাক্ষুষভাবে দৃষ্টিগোচর হবেনা, সেই আনন্দোচ্ছ্বসিত স্নেহপরিপ্লুত বক্ষঃপুটে জ'ড়িয়ে ধ'রে সংস্কৃতের বিজয় অভিযানের কথা জিজ্ঞাসা আর তিনি করবেন না, গৃহে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'বাণী বাবু! কে এলো দেখ' * বলে তিনি আর প্রাণ ঢেলে দিয়ে আদর প্রকাশ করবেন না, মৃত্যুর ঠিক আগে উপর্যুপরি দু' সপ্তাহ এসে যিনি প্রাচ্যবাণীমন্দিরের সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় যোগদান ক'রে সকলের আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধন করেছিলেন—তিনি আর তেমনটী করে কোনও দিন আমাদের কাছে ফিরে আস্‌বেন না—এ মনে হলেই যেন সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে যায়।

১৯৪৩ সালে প্রাচ্যবাণীমন্দিরের প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ থেকেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। প্রাচ্যবাণীর উন্নতির ইতিহাস তাঁর সঙ্গে বহুলভাবে বিজড়িত তা' কিঞ্চিৎ পরে উল্লেখ করছি। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায়

---

* তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয়া কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া বাণীকে আদরে "বাণী বাবু" বলে ডাক্‌তেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ মহাশয় সংস্কৃতের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ শুকদেব আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সমগ্র পরিবারের সঙ্গেই আমাদের একটী সুমধুর মমতাদান সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। প্রাচ্যবাণীর কর্মপ্রচেষ্টা মাত্রই তাঁর প্রাণপ্রিয়তর হয়ে দাঁড়ায়। আজ প্রায় আট বৎসরের ঘনসন্নিবিষ্ট ইতিহাসের মধ্যে একটি সভায়ও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, অথবা প্রাচ্যবাণীর তথা সংস্কৃতের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান তিনি করেন নি—এমন ঘটনা মনেই পড়ে না।

এ শ্রদ্ধাভাজন পুরুষবরের পূর্ব-পুরুষগণের গুণানুকীর্তনের পরে তাঁর বিষয়ে লিখ্‌তে গিয়ে, কোথায় যে আরম্ভ করবো, আর কোথায় যে শেষ করবো—তা' ভেবে ঠিক করতে পারছি না। তাঁর সঙ্গে যেন আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের প্রীতির বন্ধন ছিল, যা প্রথম দর্শনেই হয়ে পড়লো সুপ্রকট ; তাঁর প্রথম দর্শনেই মনে হলো যেন তিনি আমাদের কত আপনার জন, যেন একই ভাবের ভাবুক। সংস্কৃত সাহিত্য সংপ্রসারণের প্রকৃষ্ট সারথি খুঁজে পাওয়ার অনন্ত আনন্দে হৃদয় তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর ধীর স্থির প্রশান্ত কণ্ঠস্বরের প্রথম ধ্বনিতেই তাঁকে চিন্‌তে পারলাম ; আর মনে পড়লো মহাকবির অমিয়ময়ী বাণী—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥"

অর্থাৎ কোনও সুন্দর দৃশ্য দেখ্‌লে বা সুন্দর শব্দ শুন্‌লে স্বতঃই লোকের মনে জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি ভেসে উঠে। আমারও যেন ঠিক এ রকম অবস্থাই সেদিন হয়েছিল।

তারপর তাঁর সঙ্গে শত শত বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে—বিগত ৭।৮ বৎসরের ইতিহাস তারি ধারাবাহিক ঘটনাস্রোতের ইতিহাস। প্রাচ্যবাণী মন্দিরের উন্নতিবিধান, 'সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি'র শ্রীবৃদ্ধি, উদ্বাস্তু পণ্ডিত সমাজের কল্যাণকর ব্যবস্থা সম্পাদন প্রভৃতি নিরন্তর কর্মস্রোতে তিনিই ছিলেন আমাদের অন্যতম প্রধান সহায় ও সম্পদ্।

সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সংসাধনের নিমিত্ত তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন; এবং এ বিষয়ে কোনও কর্মপ্রচেষ্টার সংবাদ শ্রবণে তাঁর আনন্দের অবধি থাকৃতো না। প্রাচ্যবাণী মন্দিরের তিনি প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই অতি উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ মন্দিরের গবেষকমণ্ডলীর সহায়তার নিমিত্ত তিনি যে অমূল্য গ্রন্থরাজি দান করে গেছেন, তার একটী তালিকা আমরা ১৯৪৮ সালের প্রথম সংখ্যা 'প্রাচ্যবাণী'তে প্রকাশিত করেছি। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ মহাশয় ৩-২-১৯৪৮ সালে এই গ্রন্থবিভাগের উদ্বোধন করেন। স্বভাব-সুলভ বিনয় ও নিজ কৃতিত্ব গোপন রাখার আন্তরিক ইচ্ছা হেতু তিনি এই গ্রন্থসংগ্রহের সঙ্গে নিজের নাম সংযুক্ত করতে চাননি কিছুতেই; আমি জোর করে তাঁকে স্বীকার করিয়েছিলাম। কারণ—এ রকম একজন উন্নতমনা ব্যক্তির নামের সঙ্গে প্রাচ্যবাণীর একটী গ্রন্থ-সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট রাখা আমার বড়ই লোভনীয় এবং প্রয়োজনীয় ব'লে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল। আমার কোনও অনুরোধ জীবনে তিনি উপেক্ষা ত করেনই নি, বরং ক্রটীকেও স্বীকার ক'রে আমাদের আনন্দ বিধান

করেছিলেন। আমাদের গ্রন্থালয়ে সংস্কৃত পাঠার্থী বিদ্বন্মণ্ডলী গ্রন্থাদির আলোচনা করছেন জান্‌লে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন।

দেশে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে যখন নানা আন্দোলন চল্‌ছিল, তখন আমরা সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য প্রয়াসী হই। আমাদের "সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি"র সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং সংস্কৃতানুরাগী শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীনলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত। দেশে বিদেশে সর্বত্র সভাসমিতি ক'রে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ভারত সরকারের কাছে পেশ করা যখন মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর সহিত পরামর্শ-পূর্বক স্থির করা হলো—তখন বাণীর বরপুত্র সিংহ মহাশয়ের আনন্দের অবধি ছিল না। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সভা হ'তে লাগ্‌লো দিল্লী, বারাণসী প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে এবং কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে। সংস্কৃত-সেবায় দত্তপ্রাণ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রভৃতি সংস্কৃতের লোক-বিশ্রুত পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলী কর্মসমিতির সদস্যবৃন্দের বিপুলপ্রয়াসে প্রাণপণ সারথিরূপে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। জোড়াসাঁকোর সভাটী সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতেই হয়। এ সভায় বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট নাগরিক ও সুধীসজ্জন সম্মিলিত হন। পূর্ণচন্দ্রের বিপুল উৎসাহে উপস্থিত সকলের হৃদয়ে পরম আশার সঞ্চার হয়। এই সব কাজ তিনি এমন একটা স্বাভাবিক সরলতা এবং হৃদ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করতেন, যা সকলকে পরম পরিতৃপ্ত ও আকৃষ্ট করতো। তিনি যে কাজ করতেন, তা' একেবারে প্রাণ ঢেলে দিয়েই করতেন। সে জন্য তিনি তাঁর চারিপাশে এমন একটী প্রাণবন্ত পরিবেশের সৃষ্টি করতেন, যাতে অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদীর প্রাণেও নূতন উৎসাহ ও আশার সৃষ্টি হতো।

১৯৪৭ সালে দেশ যখন প্রথম স্বাধীন হয়, সেই সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার

প্রতি স্বতঃই দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বাংলা দেশের সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থানীয় সংস্কৃত কলেজে এই নিয়ে তখন পণ্ডিত মহাশয়গণ এবং সংস্কৃতানুরাগিবৃন্দের অনেক সভা-সমিতি হতো। আমি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলাম। আমাদের সাদর আহ্বানে সিংহ মহাশয় আমাদের প্রত্যেক সভায় সাতিশয় উৎসাহ ও আগ্রহের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন এবং নানাবিধ পরিকল্পনা উপস্থাপিত ক'রে আমাদের প্রভূত সহায়তা করতেন। এস্থলে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, তিনি কেবল কাগজে কলমে পরিকল্পনা পেশ করতেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না, সে পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য অকাতরে অর্থদানেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়গণ এবং সংস্কৃতানুরাগিমণ্ডলীর বহু সভা এ সময়ে তাঁর বাড়ীতে হয়। তাঁর গৃহদ্বার এজন্য সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। সত্যই দেবভাষার প্রতি এরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমি অতি অল্পই দেখেছি। তাঁর কাছে "সংস্কৃত" এই কথাটীর উচ্চারণমাত্রই যথেষ্ট ছিল; তার পরের করণীয় কাজ তিনি নিজেই করে ফেলতেন, আমাদের আর করণীয় তাতে থাকতো না। সংস্কৃতের হিতৈষণা স্বাধীন ভারতের চিন্তাশীল অধিবাসিমাত্রেই লক্ষ্যীভূত। কিন্তু চিন্তায় ও কাজে সকলে সমান পারগ নন্। সংস্কৃতের উন্নতি সাধনের উন্নত চিন্তাকে এমন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কার্যে পরিগণিত করার উচ্চ আদর্শ ও পদ্ধতি তাঁর যেমন ছিল, তেমন খুব কমই দেখা যায়।

১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের নূতন পরিকল্পনানুসারে সংস্কৃত কলেজ থেকে বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি (Bengal Sanskrit Association) বিচ্ছিন্ন হলো এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদ্—এই নূতন নামে প্রতিষ্ঠিত হলো। বিগত বৎসরের আগষ্ট মাসে প্রতি জেলা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন শিক্ষাপরিষদের পরিষদে—পশ্চিম বঙ্গের ১৫টী জেলা

থেকে মোট ১৯ জন সদস্য কলিকাতায় সমবেত হলেন। সংস্কৃতানুরাগীদের পক্ষ থেকে এদের সম্মানপ্রদর্শনের ভার গ্রহণ করলেন পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়। তাঁর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রত্যেক প্রতিনিধিকে মানপত্র প্রদান করা হয় এবং যাতে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি সম্পাদনে কোনও শৈথিল্য না ঘটতে পারে, তজ্জন্য সিংহ মহাশয় আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন কম্নেন। তাঁর আকুল আগ্রহ এবং সুদৃঢ় সঙ্কল্পে সকলে পরম প্রোৎসাহিত হন।

সংস্কৃত সাহিত্যের বহুল প্রচারোদ্দেশ্যে প্রাচ্যবাণীর বার্ষিক সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের তিনি বিশিষ্টতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এদিনটীর জন্য তিনি যেন সারা বৎসর অপেক্ষা করেই থাক্‌তেন। এবং এ জিনিষ তিনি এত ভালবাসতেন যে, তিনি সপরিবারে অভিনয়স্থলে উপস্থিত থেকে আমাদের পরম উৎসাহ প্রদান করতেন। পরের পরের বছর তিনি আমাদের এইসব অধিবেশনে আর উপস্থিত থাক্‌বেন না, এ কথা ভাবলেই যেন হৃদয় মন ভেঙ্গে পড়ে—উৎসাহের মূলশক্তি যেন চিরতরে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেছে —মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে গত বৎসরের এম্‌নি একটী সুন্দর পবিত্র দিনের কথা মনে পড়ে। কালী পূজার প্রাক্কালে "দুর্গাপূজার মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একদিন তাঁর গৃহসংলগ্ন উদ্যানে বসে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হ'লে তিনি বল্‌লেন—'এই সব তথ্য একা আমার শোনার চেয়ে সকলে মিলে শুনলে ভাল।' যেই কথা, অম্‌নি কাজ। ২।৩ দিনের মধ্যেই তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীচিন্নস্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতি বঙ্গদেশের পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন সভায় যোগদানের নিমিত্ত। সমস্ত বড় বড় পণ্ডিত এ সভায় যোগদান

করেছিলেন এবং তাঁর অমায়িক সৌজন্যে ও ভক্তিপ্রণোদিত অপূর্ব নিষ্ঠায়, এবং জ্ঞানগম্ভীর পর্যালোচনায় সকলে চরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। সেদিনের আমার বক্তৃতাটী তাঁর অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ হয়েছিল বলে আজ শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা-রূপে ঐটী তাঁর স্মৃতি-তর্পণ গ্রন্থে প্রকাশিত করা হ'ল।

৺সিংহ মহাশয় ছিলেন উচ্চদরের চিত্রশিল্পী। তাঁর অঙ্কিত বহু ছবি, তাঁর বাসভবনে সুরক্ষিত আছে এবং তাঁর উচ্চ ভাবাদর্শ ও চিত্রণ-কৌশলের সাক্ষ্য প্রদান করছে। সংস্কৃতের এই বরণীয় উপাসক অন্যদিকে বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন; প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বে তাঁর সমধিক অধিকার ছিল। এই সব বিষয়ে দেশ-বিদেশের বহু মাসিক পত্রাদি তিনি সর্বদা পাঠ করতেন এবং আহৃত জ্ঞানবলে নিজের সুরম্য পুষ্পোদ্যানটীকে নিরন্তর সমৃদ্ধতর করতেন। এই গাছপালার সঙ্গে তাঁর প্রাণের একটী সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। কোনও একটী গাছের ডালপালা একটু ভাঙ্‌লে বা অকারণে শুকিয়ে উঠ্‌লে তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্‌তো এবং অন্য কথার ফাঁকে ফাঁকে এ বিষয়ে নিরন্তর পুনরুল্লেখ করতেন। এ সব জ্ঞানালোচনা বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্তি এবং সহযোগিতা-প্রদান মানসে তিনি Zoological Society of Bengal (35, Ballygunj Circular Road)র আজীবন সদস্য ছিলেন। Jadavpur Technical Institute-র কার্যকলাপেও তিনি সর্বদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন।

তাঁর পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তিনি নিরন্তর দান করতেন। কিন্তু সে দানের অপূর্ব মাধুর্য ছিল এই যে, গ্রহীতা বুঝতে পারতেন না যে তাঁকে হাত পেতে দান গ্রহণ করতে হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব-দিবস পর্যন্ত অসংখ্য পণ্ডিত, ছাত্র, দুঃস্থ ব্যক্তি আমার কাছ থেকে পত্র নিয়ে তাঁর কাছে গেছেন।

আমার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাকালে সংস্কৃত কলেজের কত ছাত্র কতভাবে তাঁর সহায়তায় উপকৃত হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নাই। এই সব ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তিনি চির সজাগ থাক্‌তেন। কেবল অর্থদানে তিনি পরিতৃপ্ত থাক্‌তেন না; ঠিক পিতার মত স্নেহ ও শাসনও করতেন। তার সুফলও হয়েছিল অনেক। তাঁর বাড়ীতে যখনই যেতাম, বহু ছেলে সর্বদা তাঁর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও তাঁর সঙ্গে নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত দেখ্‌তে পেতাম। এমন প্রাণের সঙ্গে দান কে কোথায় দেখেছে? তাঁর এ দান কেবল সংস্কৃত কলেজেই সন্নিবদ্ধ ছিল না; সিটী, বিদ্যাসাগর, স্কটিস প্রভৃতি অন্যান্য কলেজের ছাত্রেরাও তাঁর এ প্রাণভরা দানে কৃতার্থ হতো।

প্রত্যেকেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এরূপ মাহাত্ম্যপূর্ণ দান তাঁদের আর দৃষ্টিগোচর হয়নি। অন্য কাজের ভেতরে খামের ভেতরে করে বা অন্য গোপন উপায়ে তাঁর দান ক্রিয়া নির্বাহিত হতো। একদিকে যেমন গ্রহীতা নিশ্চিন্ত-নির্ভয়ে বিপুল আনন্দে তাঁর গৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, অন্যদিকে তিনিও তেমনি গ্রহীতৃমণ্ডলীর শুভাশুভ বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করতেন। অনেক সময় এমন পুরাণো পুরাণো অতীতের বিষয় জিজ্ঞাসা করতেন—যা' ঠিক মনে করা দায় হয়ে উঠ্‌তো। কিন্তু এ সব বিষয় তাঁর নখ-দর্পণে থাক্‌তো। গ্রহীতার নাম, ঠিকানা, উপাধি এবং পারিবারিক বিপর্যয় প্রভৃতির আনুপূর্বিক ঘটনা তিনি অনায়াসে বলে যেতেন। আমরা পরম বিস্ময়ান্বিত হতাম। তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। এ প্রসঙ্গে আমি বিশেষ জোরের সঙ্গে এটুকু লিপিবদ্ধ করতে চাই—দান করেন এমন অন্য লোকও আছেন, কিন্তু এমন হৃদয় দিয়ে দান, প্রাণভরে দান—কেউ করেন কিনা সন্দেহ।

১৯৩২ সালে তিনি বিপত্নীক হন। তাঁর পতিব্রতা ভক্তিমাত্রৈকজীবিতা সাধ্বী পত্নীর ইহধাম ত্যাগের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৪২ বৎসর। শ্রীমান্ শুকদেব ও কল্যাণীয়া বাণী (তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা)—তখন শিশু মাত্র। অন্য কিছুর জন্য নয়—বড় লোকের ঘরের সহস্র কাজের বাহানায় বা শিশুদের পরিপালনের নাম করে তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নি, শুধু তাই নয়—সারা জীবন উদাত্ত চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। তিনি একাধারে মাতা ও পিতা হয়ে পুত্র-কন্যাকে মানুষ করে গেছেন; কিন্তু অতিরিক্ত বাহ্যিক আদর প্রদর্শনে এদের কোনও রকম প্রশ্রয় পাবার কোনও দিন সুযোগ দেননি। তাঁর শাসন অত্যন্ত কঠোর ছিল। একদিকে কঠোর আত্মসংযম এবং ধর্মনিষ্ঠা, অন্যদিকে স্বহস্তে যাবতীয় দৈনন্দিন নারীজনোচিত কর্তব্য নারীসুলভ নিষ্ঠা ও কুশলতার সহিত সম্পাদন—জীবনে কঠিন তপস্যার বিষয়, সন্দেহ নাই। এ কঠোর সংগ্রামে তিনি অনায়াসেই জয়ী হয়েছিলেন।

সিংহ মহাশয় উপদেশ দিতেন, কিন্তু তাঁর উপদেশের নিগূঢ়তম মাধুর্য এই যে, ঐ সব উপদেশের সত্যাসত্য স্বকীয় জীবনে তিনি পরীক্ষা করেই নির্ধারণ করে নিতেন। অগ্রজ বিজয়বাবুর মতই সমস্ত পরীক্ষা তিনি নিজের দেহ ও মনের উপরেই করতেন। পরীক্ষিত সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠ তাঁর উপদেশের গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ অতুলনীয় ছিল।

তাঁর মৃত্যুর ঠিক তিনদিন পূর্বে আমাদের প্রাচ্যবাণীর সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় তিনি তাঁর চিরকালীন উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সভায় কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সুধীমণ্ডলী যোগদান করেছিলেন। তাঁদের সকলকে নিয়ে তিনি সংস্কৃত



বনবালা সিংহ

জন্ম : ২রা পৌষ, ১৩০৫ । (১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮)

মৃত্যু : ১৪ই মাঘ, ১৩৩৬ । (২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩০)

সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য একটী নূতন পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্রতী হয়েছিলেন। এঁরা সকলে চলে যাওয়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। সেদিন আমি আবার বুঝতে পারলাম্, সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষা তাঁর কত প্রাণের, কত আদরের জিনিষ ছিল। যাবার সময় তিনি বার বার বলে গেলেন, যেন আমরা দু'জনে ২।১ দিনের মধ্যেই তাঁর কাছে যাই—তাঁর বড় প্রয়োজন। তাঁর সেই সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল স্নেহোদ্ভাসিত সৌম্য সুন্দর মূর্তিটী মনে ক'রে আজ চোখের জল রাখ্তে পারছিনা।

আজ তিনি আমাদের সম্মুখে নেই; কিন্তু তাঁর অমর আত্মার স্পর্শ আমরা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি কর্‌ছি। আমরা স্থির বিশ্বাস করি যে, অমৃতলোকের আকাঙ্ক্ষাতেও তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না, কিন্তু তাঁর নিরন্তর স্নেহমমতা পূর্বের মতই আমাদের ঘিরে থাকুক।

৺সিংহ মহাশয়ের পুণ্য চরিত লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যে কথা বারংবার আমার মনে জাগ্‌ছে সেটা হচ্ছে এই—যে ফাঁকি জীবনে তিনি কোনও দিন কাকেও দিলেন না, যে বিদ্যায় তিনি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত—সে বিদ্যায় পারদর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেলেন জীবনের অন্তিম দিবসে, তাঁর মহাপ্রয়াণ সময়ে—এবং আমাদের উপর দিযে, যাদের হৃদযের তিলমাত্র দুঃখ তিনি সহ্য কর্‌তে পারতেন না। সামান্য একটু চিকিৎসা বা সেবার সুযোগ মাত্র তিনি আমাদের দিলেন না। ফাঁকির চরম ফাঁকি আমাদের দিয়ে চলে গেলেন। অবশ্য তাঁর দিক থেকে দেখ্‌লে এটীই—কল্যাণময় প্রশস্ত পন্থা ব'লে মেনে নিতেই হয়। তাঁর মত পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি রোগযন্ত্রণা ভোগ করবেন কেন?

সহস্র সহস্র কথা মনে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে বটে; কিন্তু যেমন ক'রে করে তিনি গেলেন, তা'তে আমাদের সময়ই তো দিলেন না—বেশী কিছু

লিখ্‌বার, বেশী কিছু ভাব্‌বার। শেষের দিকে তিনি প্রায়ই বল্‌তেন, আমাদের সঙ্গে বড় জরুরী দরকার, নিরিবিলে আলাপ প্রয়োজন।

ঋগ্বেদের অমৃতময়ী ভাষার মাধ্যমে আমরাও আজ থেকে আমাদের মধ্যে আহ্বান করি—

যত্তে মরীচীঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥
যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥
যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥

ঋগ্বেদ, ১০—৫৮—৬, ১০, ১২

"তোমার যে আত্মা সুদূরে প্রসারিত কিরণমালার পথে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাহ্বান করি—সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

"তোমার যে আত্মা সুদূরে নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাহ্বান করি—সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

"তোমার যে আত্মা সুদূরে ভূত ও ভবিষ্যতে বিলীন হয়ে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাহ্বান করি—সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক।"

ঋগ্বেদ ১০—৫৮—৬, ১০, ১২

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ